নারীর কথা

NARIR KATHA

THE HUNGER PROJECT
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ

নারীর কথা–৬

NARIR KATHA-6

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১১ উপলক্ষে প্রকাশিত

সম্পাদনায়
ড. বদিউল আলম মজুমদার

৮ মার্চ, ২০১১

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট

Narir katha 6
Collected writings on the occasion of International Woman's Day
Published by:
The Hunger Project
3/7 Asad Avenue, Mohammadpur, Dhaka-1207
Tel: 8802-913-0479
Website: www.thp.org and www.thpbd.org

সম্পাদকীয়

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। শত বর্ষে প্রদার্পন করা এ ঐতিহাসিক দিবসটির এবারের মূল প্রতিপাদ্য **'শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমঅংশগ্রহণ, নিশ্চিত করবে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন'**। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং এগিয়ে যাওয়ার বলিষ্ঠ প্রত্যয় নিহিত রয়েছে প্রতিপাদ্য বিষয়ের চেতনায়। এ চেতনার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল ১৮৫৭ সালে। বেতন বৃদ্ধি, কাজের সময় নির্ধারণ ও কর্মক্ষেত্রের মান উন্নয়ন প্রভৃতি দাবিতে সেদিন নিউইয়র্কের সূচ কারখানায় সংঘটিত হয়েছিল নারী শ্রমিকের প্রতিবাদ। মালিক শ্রেণীর অমানবিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারীর সেদিনকার লড়াকু প্রত্যয় নাড়িয়ে দিয়েছিল বিশ্ব বিবেককে। বিশ্বের সকল প্রান্তে নিগৃহীত নারীদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে সংগঠিত হবার আহ্বান। তাদের ভীরু প্রাণে জ্বেলেছে অনির্বাণ সাহসের শিখা। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯১০ সালে জার্মানের সমাজতান্ত্রিক নারী নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করার ঘোষণা দেন। দিবসটি প্রথম উদযাপিত হয় ১৯১১ সালে। সেই থেকে সারা বিশ্বে নারীদের অধিকার্ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিরন্তর প্রনোদনার উৎস হিসেবে প্রতি বছর দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

গত ১০০ বছরে বিশ্বব্যাপী নারীরা বিশেষত উন্নত দেশের নারীরা অনেক দুর এগিয়েছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এমন কোন ক্ষেত্র নেই, যেখানে নারীর পদচারণা ঘটেনি। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং পেশা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, পুলিশ, সেনা, বৈমানিক, নাবিকসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদে স্বল্প পরিসরে হলেও যুক্ত হয়েছে তারা।

সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের নারীরা এখনো পিছিয়ে আছে। এদেশের নারীদের অধিকাংশই এখনো শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত। বাল্যবিবাহের কারনে শতকরা ৪১ ভাগ কিশোরীকে স্কুল ত্যাগ করতে হয়। শতকরা ৫০ ভাগ নারী পুষ্টিহীনতায় ভোগে। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, কেবল ২০১০ সালে ৮৬ জন নারী এসিড সন্ত্রাসের শিকার (সূত্র:এএসএফ) এবং প্রথম ছয় মাসে ১৪৭৯ জন নারী ধর্ষণের (সূত্র: বিআইএইচআর) শিকার হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিক থেকেও বাংলাদেশের নারীরা অনেক পিছিয়ে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মাত্র ১৯ জন নারী সরাসরিভাবে নির্বাচিত হয়েছে। গত পৌর নির্বাচনে ১৩২৬ জন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ছিল মাত্র ১১ জন নারী এবং বিজয়ী হয়েছে মাত্র ১ জন।

নারীরা উল্লেখযোগ্যহারে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত হচ্ছে আমাদের দেশে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আরও অনেক দুর যেতে হবে। গত কয়েক দশক ধরে আমাদের দেশের শ্রম বাজারে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গত এক দশকে এক কোটি ৩০ লক্ষ বাড়তি শ্রম শক্তি যুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে ৫০ লক্ষ নারী। তবে নারীরা শিকার হচ্ছে তীব্র মজুরী বৈষম্যের। বস্তুত, একই ধরনের কাজে আয়ের ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীশ্রমিকের মজুরি অসম্মানজনক। শহর এবং গ্রামভেদে এ বৈষম্য আরো প্রকট। বিবিএস ২০০৪ এর সমীক্ষায় দেখা গেছে, একই ধরনের কাজে পুরুষের তুলনায় নারীশ্রমিকের গড় মজুরী ৬৪ শতাংশ কম। যথাযথ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, অদক্ষতা ও দুর্বল স্বাস্থ্য নারীকে পরিণত করেছে কম উৎপাদনশীল কর্মীতে, যা তাদের দরকষাকষির সামর্থ্যকে দুর্বল করে দিয়েছে।

বাংলাদেশে নারীর আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় ঘটছে না। অথচ নারীর অগ্রসরতার ওপর নির্ভর করছে একটি জাতি হিসেবে কত দ্রুত এবং কতটা এগুতে পারবে। নারী শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবতী, উপার্জনক্ষম হলে আমরা কর্মক্ষম এবং সৃজনশীল ভবিষ্যত প্রজন্ম পাবো। তাই নারীর অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে নারীকে অধিকহারে নিত্যনতুন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে হলে, নারীর অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হলে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পথের বাধাসমূহ দুর করা জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এই উপলব্ধি থেকে শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং

প্রযুক্তিকে নারীর হাতের নাগালে এনে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করার জন্য আমাদের বদ্ধ পরিকর হওয়া প্রয়োজন। আসুন, বাল্যবিবাহ বন্ধ করি এবং নারীর উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করি; নারীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আইটিসহ বিভিন্ন দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক স্বল্প/মধ্য/দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের সুযোগ নিশ্চিত করি; যৌন নির্যাতন ও এসিড সন্ত্রাসসহ নারীর প্রতি সকল সহিংসতা বন্ধে দুর্বার সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলি; কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম-মুজরি প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করি; জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর গৃহস্থালী কাজের অবদানকে অন্তর্ভুক্ত করি; নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করি এবং কর্মস্থলে নারীর জন্য অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলি এবং কন্যাশিশুর প্রতি বিশেষ যত্নবান হই এবং এর মাধ্যমে উন্নততর বাংলাদেশের বীজ লালন করি।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে ইউনিয়নভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে দেশব্যাপী। নারীদের ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্যে উঠান বৈঠক, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করছে নিয়মিত। তাদেরকে উজ্জীবিত, অনুপ্রাণিত এবং সংগঠিত করছে। এছাড়াও নারীদের অগ্রগমনে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে এডভোকেসি করছে।

উজ্জীবিত এবং প্রশিক্ষিত নারীরা তাদের আত্ম উন্নয়ন এবং আত্মনির্ভরশীল জনপদ গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় সচেষ্ট এবং সক্রিয়। **নারীর কথা** এ সকল প্রচেষ্টা এবং দৃষ্টান্তেরই প্রামান্য দলিল। ২০০৬ সালে এই ধারাবাহিক প্রকাশনার প্রথম সংকলনটি বের হয়েছিল। এবার ১৫জন নারীর সাফল্যের কাহিনী নিয়ে প্রকাশিত হলো **নারীর কথা-৬**। নানা প্রতিকূলতার মাঝে যারা এ সাফল্যের কাহিনী সংগ্রহ করেছেন এবং সাফল্যগাঁথা লিখেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আশাকরি প্রতিকূলতাকে জয় করে সফলতার দিকে অগ্রসর হওয়া সফল নারীদের এ গল্পগুলো অন্যান্যদের অনুপ্রাণিত করবে। প্রকাশনার বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির 'বাংলা বানান-অভিধান' অনুসরণ করা হয়েছে। আন্ত রিক প্রচেষ্টার পরও কিছু মুদ্রণজনিত ও আনুষাঙ্গিক ভুল-ত্রুটি রয়ে গেছে। অনিচ্ছাকৃত এ সকল ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আশাকরি।

ড. বদিউল আলম মজুমদার
গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট

সম্মাননা পেলেন তিন জন মহীয়সী নারী

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উৎযাপনের শতবর্ষ পুর্তি পালিত হচ্ছে ৮ মার্চ ২০১১। উৎযাপনের এই বিশেষ সময়ে আমরা স্মরণ করছি দেশের সকল ময়ীয়সী নারীদের, যাদের অবদানে আমাদের সমাজ অনেক দুর এগিয়েছে, নারীরা ক্ষমতায়িত হয়েছে এবং কন্যাশিশুরা সহায়ক পরিবেশ পেয়েছে সম অধিকার ও সুযোগ নিয়ে দৃপ্ত প্রত্যয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১১ উপলক্ষে আমরা তিন জন মহীয়সী নারী বিপ্লবী কুমুদিনী হাজং, শিমুল ইউসুফ এবং বিভা সাংমাকে সম্মাননা প্রদাণ করছি।

নিম্নে তাদের অবদান সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরছি।

বিপ্লবী কুমুদিনী হাজং : টঙ্ক আন্দোলনে নেতৃত দানকারী একজন সংগ্রামী নারী

অত্যাচারী জমিদার, জোতদার ও সুদখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে যে টঙ্ক বিদ্রোহ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে প্রভাব সঞ্চারে ভূমিকা পালন করেছিল, যে টঙ্ক বিদ্রোহ অধিকার বঞ্চিত মেহনতী কৃষকদের বিপ্লবী রাজনৈতিক কাজের গতি বৃদ্ধি করে দিয়েছিল; সেই টঙ্ক বিদ্রোহের অগ্নিঝরা দিনগুলোর জ্বলন্ত স্বাক্ষী, জীবন্ত কিংবদন্তী বিপ্লবী নারী কুমুদিনী হাজং।

নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর থানার বহেরাতলি গ্রামে কুমুদিনী জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিন পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানের জননী। বর্তমানে তিনি তার দ্বিতীয় পুত্রের সাথে জীবনযাপন করছেন। বিদ্রোহী হিসেবে সমাজে অনন্য অবদান রাখার জন্য তাকে অনন্যা শীর্ষদশ-২০০৩, ডক্টর আহমদ শরীফ স্মারক পুরস্কার-২০০৫ এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ উপলক্ষে সিধু-কানু পুরস্কার-২০১০ পুরস্কার দেয়া হয়।

কৃষকের রক্তভেজা ঘামের ফসল নানা অজুহাতে ছলেবলে নিয়ে নিচ্ছিল অত্যাচারী জমিদার-জোতদাররা। বৃটিশ শাসকের মদদে চলছিল প্রতিবাদি কৃষকদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন। অন্যায়ভাবে কৃষকদের ঘাড়ে তারা চাপিয়ে দিচ্ছিলো নানা আইন। জমিদার ঠিক করেছেন খাজনার বদলে টঙ্ক দিতে হবে। ফসল ফলুক বা না ফলুক গুনতে হবে জমিদারের পাওনা, তিনি দিবেন শুধু জমি, হাল দিবেন না, বলদও না; বীজ ও সার কিনবে কৃষক কিন্তু টঙ্ক আদায় করবেন জমিদার। এমনি ভয়াবহ অবস্থা মোকাবেলা করতে নিপীড়িত কৃষকরা সংঘবদ্ধ হলেন। সবার কণ্ঠে এক আওয়াজ, জান দিব তবু ধান দিব না। বৃটিশরাজকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করে শ্রমিক কৃষকের রাজত্ব কয়েমের দীক্ষা নিলেন স্বামী লংকেশ্বর হাজং-এর সাথে কুমুদিনী হাজং।

শান দেয়া কাস্তের সাথে হাতে তুলে নিলেন লাল ঝান্ডা। শুরু হলো ঔপনিবেশিক শাসন মুক্তি ও শ্রমিক কৃষকের রাজত্ব কায়েমের লড়াই। সব হাজং চাষী সামিল হলো এই লড়াইতে। সংগ্রামের এমনি উত্তপ্ত দিনে বৃটিশ ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস লংকেশ্বর হাজংকে ধরে নেওয়ার জন্য হানা দিল গ্রামে। হানাদার বৃটিশ বাহিনী তাকে না পেয়ে তার

অষ্টাদশী নববধূ কুমুদিনী হাজংকে অপহরণ করে নিল। টেনে হিঁছড়ে তাকে নিয়ে যাওয়ার সময় তার প্রতিবাদ চিৎকারে বৈঠকরত হাজং নারী ও পুরুষরা ছুটে এলেন। জঙ্গী হাজং সাথীরা মুহূর্তকাল অপেক্ষা না করে কুমুদিনীকে উদ্ধারে ছুটলেন হাজং মাতা রাশমণির নেতৃত্বে। ক্ষিপ্ত হায়ানাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন তারা। সেদিনের তুমুল যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী রাশমণি ও তার সহযোদ্ধা সুরেন্দ্র, শত্রুর গুলিতে প্রাণ দিলেন, কুমুদিনী হাজং হলেন মুক্ত! তখন থেকে গৃহবধূ কুমুদিনী হয়ে উঠলেন বিপ্লবী নারী যিনি টঙ্ক আন্দোলনের সেই অগ্নিঝরা দিনগুলোতে সহযোদ্ধাদের নিয়ে সংগ্রামে আরও সক্রিয় হয়ে উঠলেন। এই সংগ্রামী নারী শুধু টঙ্ক বিদ্রোহই নয়, দেশী-বিদেশী সকল শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে সবরকম আন্দোলন সংগ্রামে অদ্যাবধি সক্রিয় থেকে সাধ্যমত কাজ করে যাচ্ছেন।

শিমুল ইউসুফ : বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব

সাংস্কৃতিক পরিবেশ মন্ডলে শিমুল ইউসুফ ১৯৫৭ সালের ২৪ মার্চ ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জনাব মেহের বিলা ছোটবেলা থেকেই বিক্রমপুরে সঙ্গীতচর্চাসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মাতাও গান বাজনা করতেন। ছোট ভাই লীনু বিলাহ এবং দীনু বিলাহও বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী, বর্তমানে তারা বিদেশে অবস্থান করছেন। সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে শিমুল ইউসুফের ছোটবেলা কাটে কমলাপুরে। পাঁচ বছর বয়স থেকেই শিমুল ইউসুফ গান করেন। শিশুদের অনুষ্ঠান "কঁচি কাঁচার মেলা' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি প্রথম টেলিভিশন ও রেডিওতে গান পরিবেশনা শুরু করেন। মাত্র দশ বছর বয়সে পাকিস্তান সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি ওস্তাদ হেলালউদ্দিন, জনাব পিসি গোমেজ, জনাব আলতাফ মাহমুদ এবং জনাব আব্দুল লতিফসহ বিভিন্ন শিক্ষকের কাছে ক্লাসিক্যাল এবং সনাতন গান শেখেন। সমাজবিজ্ঞানে তিনি অনার্স ডিগ্রী শেষ করেন এবং পরবর্তীতে ফাইন আর্টস ইন্সটিটিউশন থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করেন।

স্বামী বিখ্যাত নাট্যকার জনাব নাসিরউদ্দিন ইউসুফ নিরলসভাবে শিমুল ইউসুফকে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছেন। সঙ্গীতচর্চা ছাড়াও তিনি বিখ্যাত অনেক নাটক এবং সিনেমায় অভিনয় করেছেন। নাটক নির্দেশনা, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। ১৯৭২ সালে মরহুম আব্দুলাহ আল মামুনের নাটকের মাধ্যমে তার প্রথম অভিনয় জীবনের শুরু। ঢাকা থিয়েটারের প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই তিনি এর সঙ্গে যুক্ত আছেন। ১৯৭৫ সালে "মুনতাসির ফ্যান্টাসী" নাটকের মাধ্যমে তিনি অভিনেত্রীর স্বীকৃতি লাভ করেন। তার অভিনীত উলেখযোগ্য নাট্যসমুহের মধ্যে শকুন্ত লা, মুনতাসির, কির্ত্তনখোলা, কেরামতমঙ্গাল, হাত হদাই, প্রাচ্য, বনপাংশুল, যৈবতী কন্যার মন, বিনোদিনীসহ প্রায় ৪০০ টেলিভিশন নাটক এবং প্রায় ৩৩ বছরের কর্মজীবনে ৩০টি স্ট্রেজ শো করেছেন। প্রায় ২০০ স্ট্রেজ শো'তে তিনি গান পরিবেশন, কম্পোজিশন, ড্রেস ডিজাইনার এবং কোরিওগ্রাফার হিসেবে কাজ করেছেন। নাটককে তিনি একটা শিল্প হিসেবে দেখেন এবং একইসঙ্গে নাটককে সামাজিক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ একটা মাধ্যম হিসেবেও মনে করেন। নাটক ব্যতিত উলেখযোগ্য সিনেমা'র মধ্যে একাত্তরের যীশু, গেরিলা'র ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিশিয়ানের কাজ করেছেন। দেশে বিদেশে শিমুল ইউসুফ অনেক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

বিভা সাংমা: গারো নারী শিক্ষার দুয়ার উন্মোচক

বিভা সাংমা। গারো নারী শিক্ষার দুয়ার উন্মোচনে এবং গারো নারীদের আত্মকর্মসংস্থানে প্রেরণাদানকারী এবং সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিকারী এ মহিয়সী নারী ১৯৩৫ সালের ১লা মার্চ তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার দুর্গাপুর থানার বিরিশিরি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮ এ পরলোক গমন করেন তিনি।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে বিরিশিরি মিশন জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয় হাই স্কুলে উন্নীত হলে সেখানে তিনিই প্রথম প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এ সময়কালে তিনি গারো পরিবারগুলোকে উৎসাহিত করেন তাদের ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য। তিনি বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন, গারোরা যদি শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর না হয় এবং আত্ম কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করতে পারে তাহলে জাতি হিসেবে গারোরাসম্মানের সাথে সমাজে টিকে থাকতে পারবে না। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় গারো সমাজে শিক্ষার দুয়ার উম্মোচিত হলো।

পরবর্তীতে স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে তিনি সি.এইচ.সি.পি ও ওয়ার্ল্ড ভিশন নামক দু'টি বেসরকারি সংস্থার আর্থিক সহায়তায় গারোদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরির একটি তাঁত প্রকল্প চালু করেন। এখানে বেশ কিছু সংখ্যক গারো আদিবাসী মহিলা বয়ন-শিল্পের প্রশিক্ষণ লাভসহ আর্থিক সুবিধা লাভ করেন। ১৯৭৭ সালে বিরিশিরিতে উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি ১৬ আগস্ট ১৯৭৭ থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ তারিখ পর্যন্ত সুদীর্ঘ পনের বছর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় একাডেমীর অনেক শ্রীবৃদ্ধিসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন হয়। তাঁর পরিচালক থাকা অবস্থায়ই দেশে-বিদেশে একাডেমীর অনেক সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। বিরাট সংখ্যক গাড়ো মেয়ে তাদের আত্ম কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

পারভীন: প্রতিকূলতা যেখানে পরাহত

পৃথিবীর একমাত্র ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন, তারই কোল ঘেষে থাকা সাতক্ষীরা'র এক স্বচ্ছল পরিবারে জন্ম পারভীন আহমেদের। বাবা শামসুল হক ছিলেন ব্যবসায়ী। সাত ভাইবোনের মধ্যে পারভীনের অবস্থান তৃতীয়। গান, নাটক ও খেলাধূলায় যেমন পারদশী লেখাপড়ায়ও ছিলেন তেমনি মনোযোগী। বাগেরহাট সরকারি বালিকা বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি পাশ করেন। এইচ.এস.সি. পরীক্ষার পূর্বেই ফারুক আহমেদের সাথে বিয়ে হয় পারভীনের। পরে এইচ.এস.সি. পাশ করেন।

পারভীনের বেড়ে ওঠা প্রগতিশীল পরিবারে কিন্তু বিয়ের পর বুঝলেন তার শ্বশুর পরিবারের সবাই বেশ রক্ষণশীল । তাই প্রথমে অনেক কিছুই মেনে নিতে কষ্ট হয়েছে তার। এক ধরনের হতাশা দানা বাঁধে পারভীনের মনে । কিন্তু পারভীন এত সহজে দমে যাওয়ার পাত্র না। শ্বশুরবাড়িতে এসে সে যে পশ্চাদপদতা ও রক্ষণশীলতার মুখোমুখি হয়েছেন তাকে তো জয় করতে হবে । আর এজন্য তাকে শিক্ষিত হতে হবে। শ্বশুরবাড়ির লোকজন যতই বাধা দিক না কেন লেখাপড়া তার চালিয়ে যেতে হবে। অনেক খড়কুটো পুড়িয়ে স্বামীকে রাজী করালেও বাইরে পড়া যাবেনা বলে শেষ পর্যন্ত বাগেরহাট পিসি কলেজেই বি.এ তে ভর্তি হন। পরীক্ষার আগে বুঝতে পারেন যে সে মা হতে চলেছেন। পরিবারের সবাই ধরেই নিয়েছিলেন যে এবার আর পরীক্ষা পাশ করতে পারবে না। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে বি.এ. পাশ করলেন পারভীন। আর একটা ধাপ, এম. এ। কিন্তু এবারেও বাধা আসল। 'বি. এ তো পাশ হয়েছে আর কেন?' এমন প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হয়েছে হর হামেশাই। 'বউ হিসেবে বি.এ পাশ ডিগ্রি আছে এই তো অনেক। আর কী লাগে'। যেন বাড়ির বউয়ের ডিগ্রিটা পরিবারের আভিজাত্যের প্রতীক। এ ভৎর্সনা আর অবহেলা সত্ত্বেও পারভীন সফল হয় তার পথচলায়। এম.এ পাশ করেন তিনি।

পারভীনের স্বামীর আর্থিক সচ্ছলতা ছিল। কিন্তু সব কাজে সব সময় স্বামীর কাছে হাত পাততে ভালো লাগত না। তাই নিজের আয়ের একটা পথ খুঁজতে থাকে পারভীন। নিজ উদ্যোগে একটি বুটিক হাউজ দেয়ার পরিকল্পনা করে। সেই পরিকল্পনা আজ পরিণত হয়েছে পূর্ণাঙ্গ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে। এই ছিল পারভীনের প্রথম উদ্যোগ। প্রথম উদ্যোগে সফলতার মুখ দেখার পর পারভীন নিজের প্রতি আস্থা বেড়ে যায়। বুটিক হাউস করে পারভীন হয়তো নিজে উন্নতি করেছেন কিন্তু তার আশেপাশে তো আরো অনেক নারী রয়েছে যাদের অবস্থা আরো খারাপ। তাদের জন্য তো কিছু করা দরকার। এমন একটা চিন্তা থেকে 'জাগো নারী' নামে একটা সংগঠন তৈরি করেন পারভীন আহমেদ। শুধু নিজের সংগঠনে নয়, এলাকার বিভিন্ন সংগঠনে কাজ করছেন তিনি।

বাগেরহাট মহিলা পরিষদ এবং ডিবেটিং সোসাইটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন ছাড়াও নিয়মিত গান ও আবৃত্তি চর্চা করে যাচ্ছেন পারভীণ। সঙ্গে আছে বিভিন মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকাতে লেখালেখির চর্চা। একসঙ্গে অনেক কাজ, তারপরেও মনে হচ্ছিল যে তিনি যা করছেন তা সঠিকভাবে মানুষের কাজে আসছে না। এমনকি নিজে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না।

২০০৭ সাল। আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের জন্য মহিলা পরিষদের উদ্যোগে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। যৌথভাবে পালন করার জন্য একটি মহল থেকে প্রস্তাব দিলে আমরা রাজি হয়ে গেলাম বৈঠক করার জন্য। বাগেরহাটের কয়েকটি সংগঠন, মহিলা পরিষদ এবং তার সাথে যুক্ত হল আন্তর্জাতিক সংস্থা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ। মিটিং এ সিদ্ধান্ত হলো যে সকলে যৌথভাবে বড় আকারে অনুষ্ঠান করবো। পারভীন ঐ মিটিং-এ পরিচিত হন হাঙ্গার প্রজেক্টের সমন্বয়কারী মাহবুব উল আলম বুলবুল এর সাথে। এ আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে হাঙ্গার প্রজেক্টের আদর্শ, পন্থা আর কাজের পদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে পান। এরপর একটা আগ্রহের জায়গা থেকে শুরু হলো হাঙ্গার প্রজেক্ট সম্পর্কে জানা বোঝা। জুন মাসে ৮ম 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ শীর্ষক' ফাউন্ডেশন কোর্স এ চারদিনব্যাপী ট্রেনিং নিলেন। নারীদের সম্পর্কে তার ধারণাই পাল্টে গেল। এরপর উজ্জীবক প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন কিন্তু কাছাকাছি কোন ট্রেনিং না

হওয়ায় এ সুযোগ নিতে পাচ্ছিলেন না। ‘পরবতীতে খুলনাতে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ এর খবর পেলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম এবার অবশ্যই উজ্জীবক প্রশিক্ষণটা নেব। খুলনাতে বোনের বাসায় থেকে প্রশিক্ষণটা গ্রহন করলাম। এ প্রশিক্ষনের ফলে পারভীনের ধারনাগত জায়গার বেশ পরিবর্তন সাধিত হলো। নিজের এবং সমাজের উন্নয়ন করার জন্য যে নিজের ইচ্ছাটুকুই যথেষ্ট এ ধারনা আগে আমার ছিল না’- উজ্জীবক ট্রেনিং সম্বন্ধে পারভীন তার মনোভাব এভাবে প্রকাশ করে। এ কারনে ২০০৮ সালে হাঙ্গার প্রজেক্টের ১৩তম প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ- এ ট্রেনিং নেন।

ট্রেনিং করার পর পারভীনের হতাশা আর মানসিক অশান্তির ভাবটা অনেকাংশেই কেটে গেল। ২০০৭ সালে ল পাশ করার মধ্যে দিয়ে পারভীন তার শিক্ষাজীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জনটি লাভ করলো।

যে পারভীন আগে সাধারন নারীদের বিভিন্ন সেবা দিয়ে আসছিলেন এ্যাড্‌ভোকেট হওয়ার পর তাতে নতুন মাত্রা যোগ হলো। শুরু হল নতুন উদ্যমে মানুষের জন্য কাজ করা, বিশেষ করে অসহায় নারীদের পাশে দাঁড়ানোর। এ্যাডভোকেট পারভীন পিছিয়ে পড়া নারীদের পারিবারিক নির্যাতন, যৌতুক, বাল্যবিবাহ বন্ধসহ নির্যাতিত নারীদের বিভিন্ন কেস নিয়ে লড়াই করেন। আর এ আইনি সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্রে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তিনি কোন টাকা-পয়সা নেন না।
তার প্রত্যাশা নারীদের আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলা এজন্য তিনি তার সংগঠন “জাগোনারী ফাউন্ডেশনের” মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেনিং দিয়ে যাচ্ছেন সুবিধাবঞ্চিত এ নারীদের। এছাড়া নির্যাতিত অসহায় নারীদের সহায়তা দেয়া। বাল্যবিবাহ বন্ধ করা, যৌতুকমুক্ত বিয়ে, পুরুষের বহুবিবাহ বন্ধসহ বিভিন্ন কাজ করে যাচ্ছেন। যদি তার মত এদেশের নারীরা জেগে ওঠে এবং পুরুষরাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে বাংলাদেশের সার্বিক চেহারা দ্রুত পরিবর্তিত হবে।

তথ্য সংগ্রহ ও রচনা:
এম.এ.বুলবুল

মাকসুদা: ভাঙ্গা-গড়ার খেলায় বিজয়ী একজন

সাপের মতই লিকলিকে বহতা নদী কুমার যেন পেঁচিয়ে ধরে আছে সারা গ্রামটিকে। গ্রাম বলতে চোখের সামনে যা কিছু ভেসে ওঠে সরু মেঠোপথ, বিস্তৃর্ণ সবুজ মাঠ, ঘন বৃক্ষের পশরা আর শান্ত স্নিগ্ধতার বুক চিরে গেয়ে ওঠা পাখিদের গান। ফসল ঘরে ওঠার পর জমিতে এখন সারি সারি মটরশুঁটি আর ছোলা। গ্রামের নাম কালারচর বিষ্ণুপদ্দী। মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার কবিরাজপুরের প্রত্যন্ত একটি গ্রাম। এই গ্রামের শেষ প্রান্তে শিম, লাউ আর রকমারি সবজী বাগান দিয়ে মোড়ানো সবুজ বাড়িটি মাকসুদা পারভিনের। মাকসুদা পারভীন অবশ্য সারাদিন বাড়িতে থাকার সময় পান না। সবার প্রিয় এই সেলাই মাস্টার খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে সারাদিনের জন্য বেরিয়ে পড়েন ছোট্ট একটি ব্যাগ হাতে নিয়ে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তিনি ছয় সাতটি ব্যাচে গ্রামের মেয়েদের সেলাই প্রশিক্ষণ দেন। স্বামী, তিন মেয়ে আর এক ছেলে নিয়ে তাঁর আনন্দের সংসার। আনন্দ ঝলমল এই পরিবারটির নিপুণ কারিগর মাকসুদা বললেন, এই সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে বহুপথ পাড়ি দিয়ে। সংগ্রামের জীবনটা শুরু ছেলেবেলা থেকেই। বাজৈর থানার পাশেই ছিল বাবার বাড়ি । মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন বাবা। এরপর কয়েক বছরের মধ্যে দৈবক্রমে বড় দুইভাই মারা যান। এর ফলে তাদের পরিবারে নেমে আসে অসহনীয় দারিদ্র্য।

চতুর্থ শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় মাকসুদা জীবনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে শেখে। জীবিকা যুদ্ধে শামিল হয় ডাংগুলি মার্বেল খেলার বয়সে। তখন তিনি চার ক্লাসের ছাত্রী। গ্রামের মোল্লাকান্দিতে একটি মহিলা সমিতি ছিল। মাসিক ৫ টাকা বেতনে চাকুরি নেন মোল্লাকান্দি মহিলা সমিতি'তে। এই শুরু। দশ বছরের নাবালক শিশুর প্রবেশ ঘটে পেশাদার কর্মজীবনে। মাত্র ৫ টাকা মাসিক বেতনে মোল্লা কান্দি মহিলা সমিতি-তে চাকুরি নেন। ছোট্ট মাকসুদা এই টাকা মায়ের হাতে তুলে দিতেন নিজের লেখাপড়া আর সংসারের খরচ জোগানোর জন্য। এভাবেই কেটে যায় কয়েকটি বছর। '৭৮ সালে একটি জাতীয় পর্যায়ের ঋণদানকারী সংস্থার 'ফিল্ড অর্গানাইজার' পদে চাকুরি নেন। সেসময় নানা সামাজিক বাঁধা আসে তাঁর উপর। নারীদের আয়মুখী হতে দিতে চাইতনা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। কিন্তু তিনি দমে যাননি। দিনরাত পরিশ্রম করে নিজে সমস্ত কাজ তত্ত্বাবধান করেছেন এবং নারীদের উৎসাহিত করেছেন। মূলতঃ তখনই তিনি সমাজের নারীদের নিগৃহীত ও দুঃসহ জীবনযন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারেন। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে পিছিয়ে পড়া এই নারীদের জন্য কিছু একটা করতেই হবে। এর জন্য সবার আগে দরকার নিজের পায়ের ভিতকে মজবুত করা।

সীমাহীন দারিদ্র্য আর সংগ্রামের কারনে লেখাপড়ার পাট চুকিয়েছেন অনেক আগেই। '৮০ সালের কথা, বাংলাদেশে তখনও বাটিকের প্রচলন হয়নি। মাকসুদা নিজ উদ্যোগে একটি এনজিওর মাধ্যমে বাটিক এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কেউ তাকে উৎসাহ দিলেন না এই কাজ করতে। হস্তশিল্পের প্রতি খুব ঝোঁক ছিল মাকসুদার। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঢাকায় তিনি একটা চাকরির সুযোগ পেলেন। ঢাকায় পাড়ি জমালেন মোল্লাকান্দি গ্রামের মেয়ে মাকসুদা। বেতন ২৫০ টাকা। প্রশিক্ষক হিসেবে ব্যস্ততম দিন কাটছে মাকসুদার। ৩ বছর একটানা কাজ করলেন এই প্রতিষ্ঠানে। '৮৪ সালে ঢাকার ব্যবসায়ী এ.কে.এম সালাউদ্দিন এর সাথে বিয়ে হয় তার। শ্বশুরকুল নতুন বৌ'র চাকুরি করাটাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। তাঁর কাজ এবং একনিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠানে বেশ প্রশংসিত হয়। এরই মধ্যে তিনি আন্তর্জাতিক অঞ্জান থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে যান। সেটি ছিল একটা প্রাতিষ্ঠানিক ভ্রমণ। আর এই আমন্ত্রণকেই নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখল শ্বশুরবাড়ির লোকজন। সংসারের স্বার্থে সবকিছুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হল। চাকুরি কিংবা বিদেশ ভ্রমণ কোনটিই করা হলো না তাঁর। এইবার তাঁকে চেষ্টা করতে হবে সুগৃহিনী হবার।

কিন্তু আত্মাতে যার সংগ্রাম, সে কি আর কারো কথায় বাঁধা মানে। জমানো টাকা দিয়ে একটি সেলাই মেশিন কিনে টুকটাক কাজ শুরু করলেন। স্বামী আর দেবরের সায় পেয়ে অনিয়মিতভাবে দর্জি মাস্টারিও করতে থাকেন। ছাত্রী হিসেবে শুধু নারীরা ছিলো বলে শ্বশুরবাড়ির লোকজন এবার বেশিকিছু বলতে পারল না। ভালোই কাটছিল দিনগুলি কিন্তু ছেলের অসুস্থ্যতা আর স্বামীর ব্যবসায় ধ্বস এ দুটি কারণে তাদের ঢাকা থেকে চলে আসতে হল। কালারচর

স্বামীর বাড়ি, সেখানে এসে আবার কর্মহীন হয়ে পড়েন মাকসুদা। হতাশাগ্রস্থ স্বামী গ্রামে ফিরে দুই-তিন বছর কোন ব্যবসা দাঁড় করাতে পারলেন না। এবার স্বামীর পাশে এসে দাঁড়ালেন মাকসুদা। ঋণ নিয়ে বাড়িতে ছোট্ট একটি মুরগীর খামার গড়ে তুললেন। মাকসুদার বুঝি হাত যশ ভালো। মাত্র কয়েক মাসেই তিনি বেশ মুনাফা অর্জন করলেন। এবার তিনি মাংস ও লেয়ার উভয় ধরনের মুরগী পালন শুরু করলেন। ঘরে ফিরতে শুরু করে স্বচ্ছলতা। কিন্তু ১৯৯৮ সালের প্রলয়ংকরী বন্যায় শান্তশিষ্ট কুমার নদী প্রমত্তা হয়ে ওঠে। লুট করে নিয়ে যায় মানুষের সম্পদ, সাথে মাকসুদার কয়েক লাখ টাকা মূল্যের খামারটিও। দিশেহারা হয়ে পড়ে বাড়িঘরহারা মাকসুদার পরিবার। যা পুঁজি ছিল সব শেষ।

গাঙ যেমন সবকিছু কেড়ে নিয়ে যায় তেমনি শেখায় বাঁচার লড়াই একবারে শেষ হবার নয়। এ সময় তাঁর যোগাযোগ হয় 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট'- এর কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান রঞ্জুর সঙ্গে। মাকসুদা পারভিন উদ্যোগী হয়ে ভগ্ন গ্রামটিকে পুনরাজ্জীবিত করার প্রয়াসে আয়োজন করেন 'উজ্জীবক প্রশিক্ষণ'। তিনি নিজেও এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর উজ্জীবক প্রশিক্ষণ তাঁর জীবনের পালে এনে দেয় নতুন হাওয়া। আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে নব উদ্দমে উদ্দিপিত হন মাকসুদা। দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উজ্জীবক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি নিজের জন্য সমাজের মানুষের জন্য কিছু করার প্রেরণা এবং দিক নির্দেশনা লাভ করেন। ধার করে ৫০০ টাকা দিয়ে আবার নবউদ্যোমে জীবন শুরু করার চেষ্টা করেন।

সন্তানের সুস্থ্যতা, স্বামীর ব্যবসা পুনঃরুদ্ধার এবং নিজের পুনরাজ্জীবনের মাঝে আবার সুখের স্বপ্নটাকে জ্বলতে দেখেন। উজ্জীবক প্রশিক্ষণের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে গ্রামের নারীদের নিয়ে তিনি আবার তাঁর সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি চালু করেন। এভাবে সব নারীর সাথে একটা বন্ধনে জড়িয়ে পড়েন তিনি। দলে দলে মেয়েরা প্রশিক্ষিত হতে থাকে তাঁর লতা ট্রেনিং সেন্টারে। বেশিরভাগ দরিদ্র মেয়েরা টাকা দিতে পারতো না। তিনি বিনামূল্যে শেখান আর মেয়েরা আয়মুখী হয়ে পরে সেই ঋণ শোধ করে। তাঁর পরামর্শ নিয়ে গ্রামের প্রতিটি ঘরে গড়ে ওঠে লাউ- কুমড়ার মাচা, হাঁস-মুরগীর খোয়াড় আর গরু-ছাগলের খামার। এরপর আবার তাঁর জীবনে নেমে আসে আরো দুটি খড়গ । বাস এক্সিডেন্টের ফলে স্বামীর বুকের হাড় ভেঙে যায়। মাকসুদা ভাঙতে দেননা সংসারের হাল, এগিয়ে যেতে থাকে তাঁর লতা ট্রেনিং সেন্টার। বড় মেয়ের বিয়ে দেন আর ছোট দুই মেয়ে কবিরাজপুর হাইস্কুলে দুরন্তপনায় ব্যস্ত। ঠিক তখন নদী ভাঙ্গনে আবার তিনি ঘরবাড়ি হারান। চোরা ভাঙ্গনের টানে তলিয়ে যায় তাঁর লতা ট্রেনিং সেন্টার। এভাবে নানা দুর্যোগময় দুর্বিপাকের মধ্যেও তিনি জীবনকে অর্থপূর্ণ ও কর্মময় করে রেখেছেন। তিনি জানেন নিয়তির এই নিষ্ঠুর খেলার পরেও তাঁকেই এই সমাজের নেতৃত্ব দিতে হবে। এই সমাজে নারীরা খুব অসহায়। কিন্তু নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া এই সমাজের পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাই তিনি মাদারীপুরে অনুষ্ঠিত ৪২ তম 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক' প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর চেতনাকে আরও শানিত করেন। শূণ্য হাতে তিনি আবার চালু করেন লতা ট্রেনিং সেন্টার।

প্রথমদিকে তাঁর কথা কেউ শুনতো না। কিন্তু এখন তাকে সবাই মান্য করছে, সহযোগিতা করছে। মাকসুদার সংগ্রামী জীবন হয়েছে আরো গতিশীল, আরও শানিত। সেলাই প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পুষ্টি ও কৃষিভিত্তিক জ্ঞান দান করছেন। ইউনিয়নভিত্তিক বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক- এর পরিষদ গঠন করেছেন। নিজে তার নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সেলাই মেশিন কিনে দেয়া থেকে বিভিন্ন নারী উন্নয়নমূলক কাজ করছে তাঁর বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সদস্যরা। স্বেচ্ছাব্রতী মানসিকতা সম্পর্কে মাকসুদা বলেন, 'আমাকে দোয়া করেন, আমি যেন স্বেচ্ছাব্রতের মাধ্যমে মানুষের পাশে আজীবন থাকতে পারি'। মাকসুদা কাজ আর মানুষকে খুব ভালোবাসেন। তিনি বলেন, কাজ শিখতে হবে, কাজ শিখলে তা জীবনের কোথাও না কোথাও কাজে লাগবে। বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সদস্য হিসেবে তিনি নারীদের জীবন বিকশিত করার মহান ব্রত নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। তাই সন্ধ্যায় যখন তিনি সব কাজ শেষে করে ঘরে ফেরেন তখনও তাঁর চোখে ক্লান্তি থাকে না। তিনি বলেন, 'বন্ধ হবার আগে এই চোখ যেন ক্লান্ত না হয়, আমার জন্য দোয়া করবেন'। স্বেচ্ছাব্রতী মানসিকতা নিয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট- এর সাথে কাজ করে একদিকে যেমন তিনি নিজেকে শানিত করছেন, অন্যদিকে মানুষের জন্য নিরলসভাবে কাজও করে যাচ্ছেন। এই আলো ছড়াতে চাইছেন সমাজের সর্বস্তরে। এই স্বেচ্ছাব্রতী মানসিকতা মাধ্যমেই আমাদের সমাজে আসবে সেই কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন।

তথ্য সংগ্রহ রচনা: হামিদুল হক, আঞ্চলিক কার্যালয়, বরিশাল

হালিমা: বিবর্ণ একমুঠো স্বপ্ন

বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি যাবার পথে ঘোড়ার গাড়ি যখন পুকুরপাড়, মোড়ের মসজিদ, গ্রামের বাজার, প্রাইমারি স্কুল পার হয়ে যাচ্ছিল তখন গাড়ির মধ্যে বসে নতুন বউ সাজে ঘোমটার আড়ালে হালিমার কেবলি দাদির কথা মনে পড়ছিল। এত লাফঝাঁপ, দড়িখেলা সবই বন্ধ হয়ে যাবে, শুধু বিয়েটা একবার হোক । হালিমা দাদির কাছে জানতে চেয়েছিল, বিয়ের পর তোমার খেলাও কি বন্ধ হয়েছিল দাদি? হতাশায় ভরপুর শান্ত চোখে চেয়ে দাদি উত্তর দিয়েছিল, হ বোন; শুধু কি খেলাধুলা, বাপেরবাড়ি, সঙ্গীসাথি সবই পর হয়ে যায়। দাদির কথা সেদিন হালিমার মনে না ধরলেও আজ ঘোড়ার গাড়িতে বসে লাল শাড়িতে মোড়া হালিমা ঠিকই উপলব্ধি করতে পারছে কিভাবে তার এতদিনের আপন সবকিছুকে পিছনে ফেলে ঘোড়ার গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। একসময় পিছনে পড়ে থাকল তার স্মৃতি বিজরিত গ্রাম খলিসাকুন্ডি।

হালিমার শ্বশুরবাড়িটা বেশ বড়, ১২ সদস্যের। এখানে শ্বশুরমশায়ের কথাই সব। হালিমা এ বাড়ির মেজ বউ, স্বভাবতই অনেক কাজের ভার তার ঘাড়ে। কিন্তু ঘাড়টা অতটা শক্ত নয়, যতটা শক্ত ভার। কতই বা বয়স, এই বছরে মেট্রিক পরীক্ষা দেবার কথা ছিল। কিন্তু আট কন্যার পিতা দায়মুক্ত হতে মেট্রিক পরীক্ষার চেয়ে বিয়েকে গুরুত্ব দিলেন বেশী। হালিমার মেট্রিক পরীক্ষা যত এগিয়ে আসতে লাগল, পরীক্ষা দেয়ার সম্ভাবনাও তত কমতে থাকল। শ্বশুরবাড়ির কোন মেয়েকে বাইরে যেতে হলে তাকে পর্দা করে কোন পুরুষের দায়িত্বে যেতে হবে- এমন আইন বহাল এই পরিবারের নারীদের জন্য, সেখানে বাড়ির বউ পরীক্ষা দেবে? অসম্ভব!

তবে মুক্তচিন্তার অধিকারী দেবরের সহায়তায় শেষ পর্যন্ত অনুমতি মিললো। সারাদিন সংসারের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর পরীক্ষার জন্য দিনেরবেলা প্রস্তুতি নেবার সুযোগ হত না তার, রাতে ঘুমঘুম চোখ নিয়ে পড়তে বসে হালিমা প্রতিদিন একটি প্রতিজ্ঞা করতো,আমাকে যেকোন মূল্যে পাশ করতে হবে। রং কালো মেয়েকে বিয়ে করার কারনে স্বামীর মনে যে কষ্ট পরীক্ষায় পাশ সেক্ষেত্রে সান্ত্বনা হিসেবে কাজ করবে। পরীক্ষা পাশ করলো হালিমা। ম্যাটিক পাশ বউ হিসাবে শ্বশুরবাড়ির মানুষের যতটা খুশি হবার কথা ছিল ঠিক ততটায় যেন কষ্ট পেল। যেহেতু অনেক আপত্তি সত্ত্বেও হালিমা পরীক্ষায় অংশগ্রহন করেছিল তাই তার সাফল্যকে সবাই খুশি মনে গ্রহন করতে পারলো না।

কলেজে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র উৎসাহ প্রদানকারী হলেন দেবর। কিন্তু এসএসসি পরীক্ষায় অনুমতি দিয়ে তার শ্বশুর যে ভুল করেছিল সেই ভুল তিনি দ্বিতীয়বার করতে চাইলেন না। সোজা জানিয়ে দিলেন, আমার সংসারে থেকে এসব চলবেনা। বাবার কথা অমান্য করে নিজের স্ত্রীর ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেবার স্পর্ধা দেখাতে পারলেন না স্বামী। কারন ততদিনে এমন কোন আয়ের সংস্থান হয়নি তার । অগত্যা বাবার সিদ্ধান্তই বহাল থাকল। হালিমার অবস্থা ছিল আরো নাজুক। বিয়ের সময় জামাইকে উপহার হিসেবে যা দেবার কথা ছিল তার এক কানাকড়িও দেওয়া হয়নি এই কথা দিনে অন্তত কয়েক বার শুনতে হয়। হালিমার ছোট খাট যেকোন অপরাধের এটাই ছিল তাৎক্ষনিক শাস্তি।

প্রতিনিয়ত যা অসহ্য, সময় গড়িয়ে তা একসময় সহনীয় হয়ে গেল। এটাই নিয়তি বলে মেনে নিয়েছে হালিমা। কিন্তু নিয়তির কাছে এই নিরব আত্মসমর্পনেও তার শান্তি মেলেনি। '৭৭ সালে হালিমা মা হলেন, প্রথম মা হবার আনন্দের সাথে কমতি ছিল না সংসারের কাজের চাপের। শুধু কমতি ছিল অনাগত শিশুটির জন্য পুষ্টিকর খাবার, বিশ্রাম আর সহানুভূতির।

একদিন সকালে বাড়ির উঠোন ঝাড়ু দিতে গিয়ে হালিমা মাথা ঘুরে পড়ে যায়। স্বামী বাড়িতেই ছিল, সে ডাক্তার ডেকে আনে। ডাক্তার জানায় হালিমার অবস্থা সংকটাপন্ন, পর্যাপ্ত বিশ্রাম না নিলে তার অনাগত সন্তান ও মায়ের বড় ধরনের ক্ষতি হবে। নিজের অসহায়ত্বকে ছাপিয়ে সেদিন প্রতিবাদের ভিন্ন মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল হালিমার স্বামী। ফলাফলস্বরুপ

বাড়ি ছাড়তে হলো তাদের। গ্রামের চাচা সম্পর্কের একজনের কুড়ে ঘরে আশ্রয় নিলো। স্বামী ফুটপাতে সাইকেল সারাই করে জীবন বাঁচানোর মতো দু'মুঠো ভাতের জোগাড় করতেই হিমসিম খেত। এভাবে কষ্ট আর পরিশ্রমকে সঙ্গী করে কেটেছে কয়েক বছর। ১৯৮৪ সালে গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় গড়ে উঠে,হালিমা বিনা বেতনে সেখানে যোগদান করে, শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর ঐ পরিবারের একটি মানুষ তাদের পাশে এসে না দাঁড়ালেও তার দেবর কখনো পর হয়ে যায়নি। স্কুলে যোগদানও তারই চেষ্টা আর উৎসাহের ফল। '৮৮ সাল থেকে স্কুল বেতন দেয়া শুরু করে। একটু-আধটু জমিয়ে এক টুকরো জমি আর দুটো দোচালা উঠায় তারা। এতদিনে দুটি সন্তান,স্বামীকে নিয়ে মাথা গোজার ঠাঁই, দু'মুঠো ভাতের সংস্থান হলেও সচ্ছলতা ধরা দেয়নি তার কাছে।

২০০১ সাল ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের পরিচালনায় ৪ দিনের একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন হালিমার দেবর আবুল কাশেম। ভাবীকে প্রশিক্ষণের উপযুক্ত আংশগ্রহনকারী হিসাবে যুক্ত করলেন। ৭২৯তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করে হালিমা ৪৫ বছর বয়সে আবার নিজেকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করান। নিজের ভেতরে একটা শক্তি অনুভব করে, একটা আত্মবিশ্বাসও তৈরী হয় হালিমার- পরিবর্তন সম্ভব,আমিই পারি পরিবর্তন করতে এবং আমাকেই সেই পরিবর্তন করতে হবে। এই পরিবর্তনে তার পাথেয় হবে তার অতীত অভিজ্ঞতা। একজন নারী হিসাবে সে যতটা অসহায় সময় পার করে এসেছে সেই তাড়নায় আজ তাকে নতুন ভাবে ভাবতে শেখাবে।

প্রশিক্ষন শেষে হালিমা তার সাথে সখ্যতা আছে পাড়ার এমন সকল নারীকে নিয়ে নিজের বাড়িতে বৈঠক করে, প্রশিক্ষনে যে সকল প্রশ্ন তাকে ভাবিয়ে ছিল। যে স্বপ্ন তিনি নিজের মাঝে নতুনভাবে রচনা করছেন সেসব কথা সবাইকে জানায়।সকলে কমবেশি সম্মতি জানালেও স্বামী তাকে বলে তুমি অবশ্যই পারবে। হালিমার চিন্তা এখন আর শুধু নিজেকে ঘিরে না। স্বপ্নের পিছনে ছুটতে ছুটতে তার জীবনের অনেকটা সময় পার করে এলেও এখনো অনেক হালিমা মানুষের মতো বাঁচার জন্য প্রতিদিন স্বপ্ন তৈরি করে। 'আমি তাদের স্বপ্নগুলোকে বিবর্ণ হতে দিতে পারিনা। আমার এই কাজে আমি তোমাকে পাশে পাব জানি'। স্বামীও অভয় দিয়েছিল।

প্রথমে ৩০ জন নারী সংগঠিত হয়ে সংসারের আর্থিক সচ্ছলতা আনার জন্য সাংসারিক কাজের বাইরে অবসর সময়কে কাজে লাগাতে একমত হলো। কিন্তু কী কাজ করবে তারা? কী কাজই বা তারা জানে এমন প্রশ্নও হালিমা করে হতাশ। কিন্তু হালিমা আশাহত হয়নি। সে বলেছিল, আমি সেলাই মেশিনে সেলাই করতে জানি, আমি তোমাদের শেখাবো, কিন্তু তার জন্য সেলাই মেশিন প্রয়োজন, প্রয়োজন টাকার। সিদ্ধান্ত হলো, প্রত্যেকে ১০০ টাকা করে দেবে, হবে ৩০০০ হাজার টাকা বাকী ২০০০ হাজার টাকা কোথা থেকে আসবে, এবারও এগিয়ে এলেন দেবর আবুল কাশেম। নিজের পরিচিত দোকান থেকে দুই হাজার টাকা বাকীতে মেশিন কেনা হল। শুরু হলো প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণে সকলের অত্যন্ত আগ্রহ, পরিশ্রম আর চেষ্টায় মোটামুটি ২০জন দক্ষ হয়ে উঠল। কিন্তু কাজ কোথায়? কে দেবে তাদের কাজ। তারা যে পারবে সেটি প্রমান করার সুযোগ তো কখনো মেলেনি। সেই আবুল কাশেম হাটবোয়ালিয়া বাজারের পোশাক তৈরি দোকান থেকে অল্প কিছু অর্ডার জোগাড় করে দিলেন। আর বললেন, এই কাজগুলো ভালোভাবে করতে পারলে আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা থেকেও অর্ডার মিলবে। হয়েছিলও তাই, হালিমার গড়ে তোলা শ্রম নারী উন্নয়ন সমিতি'র কাজের সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। তাদেরকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। শুধু কাজ আর কাজ, হালিমা নিয়ম করলেন, প্রত্যেক সদস্য তার আয় থেকে প্রতিদিন ১০টি টাকা জমা করবে সংগঠনের তহবিলে। একমাস পর সেই টাকা দিয়ে সেলাই মেশিন কেনা হবে। ২০০৯ সালে এসে সংগঠনের সদস্য দাঁড়াল ৫০ জন। মেশিনের সংখ্যা ত্রিশ।

২০১০ সালে এসে হালিমার সংগঠন নতুন মাত্রা পায়, হালিমা হাঙ্গার প্রজেক্ট হতে ৪৮তম নারী নেতৃত্ব বিকাশ শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্স করার সুযোগ পায়। এখানে এসে সে উপলব্ধি করে যে নারীদের নিয়ে তার সংগঠন যে আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করেছে সে আয় দিয়ে নারীর জীবনের অবস্থার বা অবস্থানের পরিবর্তন সম্ভব নয়। তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অধিকার, বৈষম্যের মতো মৌলিক বিষয়গুলো সম্বন্ধে জানতে হবে। শুরু হয় শ্রম নারী উন্নয়ন সমিতি'র সামাজিক

কার্যক্রম। প্রচার, প্রচারণা, পরামর্শ, সহযোগিতার মাধ্যমে 'শ্রম নারী উন্নয়ন সমিতি' হয়ে উঠেছে নারীদের আশ্রয়স্থল। একসময় এলাকার মানুষ এই নারীদের একত্রিত হওয়াকে উপহাস আর তাচ্ছিল্য করতো। আজ সেই মানুষগুলোই পরিশ্রম আর সফলতার উদাহরণ হিসাবে হালিমাকে জানে। গ্রাম সালিশে ডাকা হয় তাকে। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি, ইউনিয়নের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটিসহ বেশ কয়েকটি সামাজিক কার্যক্রমে নিজ যোগ্যতায় জায়গা করে নিয়েছে হালিমা।

হালিমা আজ এমন গ্রামের স্বপ্ন দেখে যেখানে কোন নারীর পিঠ দোররার আঘাতে হবে না রক্তাক্ত, নির্যাতনের ফলে কোন নারী বেছে নিবে না আত্মহননের পথ, বখাটের ভয়ে বন্ধ হবে না কোন কিশোরীর স্কুল যাওয়া।

তথ্য সংগ্রহ ও রচনা: মোঃ আব্দুস সবুর।

রাশিদা: লাজুক লতা হতে অগ্নিকণ্যা

রাশিদার স্বামী দারিদ্র্যের কাছে পরাজিত হয়ে এলাকা ছেড়ে ঢাকায় পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাশিদা স্বামীর সাথে একমত হননি, সে লড়তে চেয়েছে, শেষ পর্যন্ত জয়ীও হয়েছেন। বাঁচার তাগিদে নয়, সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখেছেন এবং অন্য নারীদেরকেও শিখিয়েছেন।

যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলার বন্দবিলা গ্রামের মোটামুটি স্বচ্ছল কৃষক ঘরে জন্ম রাশিদার। মা গৃহিনী। বাবা-মার এগার ভাইবোনের মধ্যে রাশিদা ছিল সবার ছোট। বাবার ছিল প্রায় ১৫-১৬ বিঘা আবাদী জমি। তাই পরিবারে অনেক ভাই-বোন হওয়া সত্ত্বেও খাওয়া পরার অভাব ছিল না। শৈশব ও কৈশোর কেটেছে চিত্রা নদীর কোল ঘেষে গড়ে ওঠা সবুজ-শ্যামল গ্রামে । জীবন-সংসার বুঝে উঠার আগেই কুসংস্কারের কারণে দশম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় বিয়ে হয়ে যায় । তারপর আর লেখাপড়া করা হয়নি।

একই ইউনিয়নে পার্বতীপুর গ্রামের শাজাহান সাজু'র সাথে বিয়ে হওয়ার পর শুরু হয় নতুন জীবন। স্বামীর বসতবাড়িসহ আবাদী চার বিঘা জমি ছিল। স্বামী মোটামুটি ভাল ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও বাবা-মা মারা যাওয়ার কারণে এসএসসি পাশ করার পর আর লেখাপড়া করতে পারেনি। স্বামীর কৃষিকাজের তেমন অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু, সমাজসেবী এবং পরোপকারী বলে তার পরিচিতি ছিল গ্রামে। নিজের জমি বিক্রি করে মানুষের উপকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি তিনি। এভাবেই কিছু জমি বিক্রি করেন তার স্বামী। তারপর নিজে বিদেশ যাওয়ার জন্য অবশিষ্ট আবাদী জমিটুকু বিক্রি করেন। কিন্তু সেখানেও প্রতারিত হয়ে সর্বশান্ত হয়ে যায় পুরো পরিবার। সবকিছু হারিয়ে বসতবাড়ির আট শতক জমিই এখন তাদের শেষ সম্বল । স্বামী স্থানীয় বাজারে ছোট একটি দোকান (ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স) দিয়েও তেমন কোন উন্নতি করতে পারেনি। এমতাবস্থায় স্বামী ও দুই ছেলেকে নিয়ে চারিদিকে অন্ধকার দেখছিলেন রাশিদা। স্বামী তাকে বার বার বলেছেন চলো কাউকে কিছু না বলে ঘরে তালা দিয়ে ঢাকায় চলে যাই। কিন্তু তিনি রাজি হননি। শত কষ্টের মাঝেও স্বপ্ন দেখেছেন মাথা উঁচু করে বাঁচার জন্য।

যখন চরম হতাশার মাঝে কাটছিল তাদের জীবন। সেই সময় এলাকার শহীদ সিরাজউদ্দিন ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ এর স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক গোপিকান্ত সরকার এবং উজ্জীবক আইয়ুব হোসেনের অনুপ্রেরণায় অংশগ্রহণ করেন উজ্জীবক প্রশিক্ষণে। গাইদঘাট কৃষি প্রযুক্তি বাস্তবায়ন কেন্দ্রে ১২৭৩তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণ, রাশিদার সাথে তার স্বামীও অংশগ্রহণ করেন।

এই উজ্জীবক প্রশিক্ষণটি তার অর্ন্তদৃষ্টি খুলে দেয়। তিনি নিজেকে নতুনভাবে আবিস্কার করে। আগে তিনি একজন নারী হিসেবে জীবন-সংসারের চার দেয়ালের বাইরের জগতটা নিয়ে ভাবার সুযোগই পাননি। শুধু ইচ্ছাশক্তির জোরে যে অনেক কিছু করা সম্ভব তা কখনোই তার ভাবনায় আসেনি। প্রশিক্ষণের পরে বাড়িতে ফিরে এই বিষয়গুলো নিয়ে স্বামীর সাথে খোলামেলা আলোচনা হতো। স্বামীও তাকে আশ্বস্ত করেন এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

প্রশিক্ষণের পরে কিছু একটা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন রাশিদা। কিন্তু, কিছু করার মত কোন পুঁজি তার হাতে ছিল না। হাঁস-মুরগী এবং ডিম বিক্রি করা ৩৫০ টাকা দিয়ে কাপড় ও সুতা কিনে নক্শীকাঁথা সেলাই-এর কাজ শুরু করেন। কাঁথা সেলাইয়ের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ তার ছিলনা। ছোটবেলাই শখের বশে প্রতিবেশীদের কাছে যতটুকু শিখেছিলেন তাঁকে পুঁজি করে শুরু করেন। পনের দিনে কাঁথাটি সেলাই করে ১৫০০ টাকায় বিক্রি করেন। পনের দিনের কাজে ১১৫০ টাকা লাভ হয়। টাকার পরিমাণ অল্প হলেও নিজের প্রতি অনেক বেশী আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়। তারপর তাকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি। দুই মাসের মধ্যে নিজে এবং গ্রামের আরও কয়েকজন নারীকে সম্পৃক্ত করেন এই কাজে।

কাজটি করতে গিয়ে সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। গৃহস্থ বাড়ির বৌ শখের বশে কাঁথা সেলাই করলেও কোন কথা নেই। কিন্তু জীবিকা নির্বাহের জন্য/সংসার চালানোর জন্য কাঁথা সেলাইকে পেশা হিসেবে নেওয়াকে ছোট কাজ মনে করতো আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের অনেকেই। স্বামী বাজারজাত করার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন। গ্রামের অনেক নারীর স্বামী সংসারে অভাব থাকা সত্ত্বেও তাদের এই কাজ করতে দিতে চায়নি। তাদের বুঝাতে হয়েছে। অনেক বাবা-মা অভাবের কারণে মেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলেও মেয়েকে কাঁথা সেলাই করতে দিতে চাইত না। তাদেরকে বুঝিয়ে রাজী করতে দিতে চাইত না। তাদেরকে বুঝিয়ে রাজি করতে হয়েছে। বর্তমান চিত্র অবশ্য ভিন্ন। এখন আর এই প্রতিবন্ধকতাগুলো আর নেই। এখন নিজ গ্রামের ১৫জন সহ বন্দবিলা, কেশবপুর ও চন্ডীপুর গ্রামের মোট ৩৫জন নারী জড়িত এই সেলাই প্রকল্পে। তারা নক্শীকাঁথা ও বেডশিট সেলাই এর কাজ করেন।

নিজেদের কোন পুঁজি ছাড়াই তারা শুধু শ্রম দিয়ে মাসে আয় করছেন ১২০০- ২৫০০ টাকা। রাশিদা নিজেও প্রতি মাসে এই উদ্যোগ থেকে আয় করেন ৪০০০-৫০০০ টাকা। এই উদ্যোগের পাশাপাশি ২০০৮ সালের শেষের দিকে মেঘনা লাইফ ইন্সুরেন্স এর বীমা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ শুরু করেন তিনি । এখান থেকেও তার বর্তমানে মাসিক ৩০০০-৪০০০ টাকা আয় হয়।

একজন উজ্জীবক হিসেবে ২০০৮ সালে যে সংগ্রাম তিনি শুরু করেছিলেন। নারী নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষন গ্রহণের পর তা আরো বেগমান হয়। যশোর আর, আর, এফ ট্রেনিং সেন্টার-এ ২০০৮ মার্চ এ অনুষ্ঠিত ২৪তম নারী নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষন (ফাউন্ডেশন কোর্স) গ্রহণ করেন তিনি। তারপর মাসিক ফলোআফ মিটিং ও ট্রেনিংগুলো চিন্তার প্রসার ঘটায় এবং আত্মবিশ্বাস আরো বাড়িয়ে দেয়। রাশিদার সংগ্রাম শুরু হয়েছিল নিজের জীবন ও পরিবারেকে কেন্দ্র করে তা আজ অনেক বিস্তৃত। এক সময় তার মাথায় ছিল শুধু পরিবারের আর্থিক দৈন্যতা ঘুচিয়ে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার ভাবনা । সেখানে তিনি সফল হয়েছেন। এখন প্রতি মাসে তার আয় ৮০০০-৯০০০ টাকা। এই টাকা দিয়েই তাদের সংসার চলে। একজন নারীও যে সংসারের পুরো আর্থিক চাহিদা মেটাতে পারে তা প্রমান করেছেন তিনি। স্বামীর অর্থের উপর একজন নারীকে নির্ভর করতে হবে প্রচলিত এই ভুল ভেঙ্গে দিয়েছেন তিনি। স্বামীর তেমন কোন আয় ছিল না তাই পুরো সংসারের খরচ বহন করতে হতো তাকে। দু'টি ছেলের লেখাপড়া চলে তার উপার্জনের টাকায়। দুটি ছেলের পাশাপাশি পাশের গ্রামের একটি মেয়ে সে দত্তক নিয়েছেন। বাবার দুর্ঘটনার পরে মেয়েটির লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। এখন মেয়েটি চন্ডিপর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩য় শ্রেণীতে পড়ে।

রাশিদার দৃষ্টি পরিবারের গন্ডি পেরিয়ে এখন অনেক সামনে । সে নিজের পাশাপাশি এলাকার পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নতির কথা ভাবে । সে দেখেছে প্রতিবেশী অনেক পরিবারেই অসচ্ছলতার কারণে মেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। এখন অনেক ছাত্রীদেরকে সে যুক্ত করেছে সেলাই-এর কাজে। পিংকী, উর্মি, শেফালী, মনিরা তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। যারা তাদের লেখাপড়ার খরচ নিজেরাই জোগাড় করে এখন। এই আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন করতে না পারলে এতদিনে হয়তো তাদের লেখাপড়াই বন্ধ হয়ে যেত। লেখাপড়ার পাশাপাশি অবসর সময়ে সেলাই এর কাজ করে স্বনির্ভরতা অর্জন করে এই ছাত্রীরা এখন অনেক আত্মবিশ্বাসী।

সেলাই থেকে উপার্জিত অর্থে অনেক মা তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ যোগান দেন। তাদের এই উপার্জন না থাকলে দারিদ্র্যের কষাঘাতে পড়ে হয়তো এতদিন তাদের সন্তানদের লেখাপড়া বন্ধই হয়ে যেত। তাসপিম, নুরজাহান, রহিমা, জুলেখা, মমতাজ এর মায়েরা তাদের অর্জিত অর্থে সংসারের অভাব দুর করেছেন।

নারীদের আর্থিক স্বর্নিভরতা অর্জনের পাশাপাশি তাদের বিকাশের জন্য বাল্যবিবাহ বন্ধ এবং স্কুলে যাওয়া নিশ্চিত করার জন্য কাজ করেছেন তিনি। তার উদ্যোগে এলাকায় ৩টি বাল্যবিবাহ বন্ধ হয়েছে।

এছাড়াও এলাকার মানুষকে সচেতন করতে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানো স্যানিটেশন বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে নিয়মিত আলোচনা সভা, উঠান বৈঠক, ক্যাম্পেইন করেন তিনি। এ সকল কর্মকান্ডের মাধ্যমে সমাজে গ্রহনযোগ্যতাও তৈরি হয়েছে তার। তাইতো এলাকার বিচার সালিশে এখন ডাক পড়ে তার। ব্যক্তিগতভাবে অনেক নারীও আসেন তার কাছে বুদ্ধি-পরামর্শের জন্য।

বর্তমানে চন্ডিপুর সরকারী প্রাথমিক বিধ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটির সদস্য সে। রাশিদার সেলাই প্রকল্পে তার ব্যক্তিগত পুঁজি প্রায় ৫০,০০০ টাকা। মাত্র ৩৫০ টাকা পুঁজি সম্বল করে সংগ্রামের মদ্য দিয়ে এ পর্যন্ত এসেছেন তিনি।

সেদিন দারিদ্র্যের কাছে পরাজিত হয়ে রাশিদা যদি স্বামীর কথা মতো তার সাথে ঢাকায় পালিয়ে যেত তাহলে হয়তো শুধু তার জীবনের পরিবর্তন ঘটতো কিন্তু তার আশেপাশের এই নারীদের জীবনে কোন পরিবর্তন আসতো না আর সমাজে এখন তার যে সম্মান সেটা হয়তো পেত না। এলাকায় সে এখন সকলের কাছে অনুপ্রেরনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এলাকার সকল বেকার নারীর আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরী করা। আর সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করা। আমাদের বিশ্বাস এখানেও সে সফল হবে।

তথ্য সংগ্রহ ও রচনা: মো: খোরশেদ আলম।

শেফালীর স্বপ্ন যাত্রা

অজপাড়া গাঁয়ের জীর্ণ কুটির। উঠানে শীতল পাটি বিছিয়ে বসে আছে ২০/২২ জন মহিলা। আর তাদের উদ্দেশ্যে স্যানিটেশন বিষয়ে বক্তব্য রাখছে সে গ্রামেরই এক মহিলা। সবাই মনোযোগী ছাত্রের ন্যায় তার কথা শুনছে। মাঝে মধ্যে প্রশ্ন করছে টাকা নাই কী করে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন বসাবে? ডায়রিয়া আমাশয় কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে ঘরে ঘরে? আর এসব প্রশ্নের উত্তর ধৈর্য্য সহকারে দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে একের পর এক। ক্লান্তি নেই, নেই কোন বিরক্তি। এ আত্মপ্রত্যয়ী নারী আর কেউ নয় আমাদের শেফালী।

পুরো নাম শাহনাজ পারভীন, শেফালী। জন্ম কক্সবাজার মহেশখালী'র কালারমারছড়া ইউনিয়নের মোহাম্মদ শাহ ঘোনা গ্রামে। বাবা মোজাফ্ফর আহমদ মাতব্বর, মা ফাতেমা বেগম। শেফালী একটি ফুলের নাম। সদ্য জন্ম নেয়া ফুট ফুটে শাহনাজ পারভীন দেখতে ফুলের মতোই। মায়াবী চেহারা আর সুন্দর চাহনীর জন্য শেফালী সবার আদরের পাত্র হয়ে যায়। ছোটবেলা থেকেই এলাকায় বেশ সুনাম অর্জন করে। গানের কারনে বেশ খ্যাতিও অর্জন করে ফেলে শেফালী ঘোষ। ৫ বৎসর বয়সে পাড়ার এক বিয়ে বাড়ীতে গান গেয়ে শাহনাজ পারভীন ঐ শেফালী নামের খ্যাতি পায়।

শেফালী যখন ১২/১৩ বৎসরের কিশোরী তখনই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ভোগবাদী লালসার কবলে পড়ে। তার সুন্দর চেহারাই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। সবেমাত্র সপ্তম শ্রেণীর পরীক্ষা দিবে এমন সময় তার জন্য বিয়ের প্রস্তাব এল একের পর এক। বাড়ীর সবাই বলল সুন্দর যুবতি মেয়ে ঘরে রাখা বিপদ। কিন্তু শেফালী ছিল প্রতিবাদী তার সোজা জবাব, না এখন বিয়ে নয়, লেখাপড়া। কিন্তু কে শুনে তার কথা। বিয়ে তারা দিবেই। শেষ পর্যন্ত বিয়ের দিন তারিখ প্রায় ঠিক হয়ে গেল এমন সময় শেফালী তার মনের কথা জানালো যে সে পাড়ার এক ছেলেকে ভালবাসে। বিয়ে যদি দিতে হয় তার সাথেই দিতে হবে। কৌলিন সমাজ তার কথা শুনতে চাইল না। অগত্যা শেফালী আর কোন উপায়ন্তর না দেখে মনে যা চাইল তাই করলো। ভালবাসার মানুষটির সাথে পালিয়ে গেল। ভালোবাসার মানুষটির নাম মীর কাশেম। সুখেই কাটছিল বিয়ের প্রথম দিনগুলি। কিন্তু তার এ সুখ বেশিদিন স্থায়ী হলো না । বিয়ের এক বৎসর পর পাগল হয়ে গেল সেই মনের মানুষ। শিকল দিয়েও বেঁধে রাখা দায়। কিন্তু শেফালী হতাশ হবার পাত্র নয়। সে জোর প্রচেষ্টা চালাল। কিন্তু দরিদ্র পরিবারে তা আর কতদিন। এদিকে ছেলের এ দশার জন্য সব দোষ গিয়ে পড়লো নতুন বউয়ের উপর। বউ অলুক্ষনে না হলে কী আর এমন হয়, এত ভালো, সুস্থ সবল ছেলেটা কী পাগল হয়ে যায়। শ্বশুর শ্বাশুড়ি আর আশেপাশের মানুষের এসব গঞ্জনা-বঞ্চনা সহ্য করে তবুও মানসিক রোগাক্রান্ত স্বামীর সেবা শুশ্রূষা নিয়ে ব্যস্ত। এরই মাঝে তাদের কোল জুড়ে এল ফুটফুটে এক মেয়ে সন্তান। তার জন্মের কয়দিন পর মীর কাশেম তার ভালবাসার শেফালীকে একা ফেলে চলে গেল পরপারে। স্বামীর মৃত্যুর পর তার আর শ্বশুর বাড়ী থাকা হলো না। ফিরে এল বাবারবাড়ীতে। কিন্তু একটা পরিবর্তন সে স্পষ্টই টের পায়, তার আগের সেই কদর নেই নিজবাড়ীতে। বাড়ীর সবাই আবার তাকে বিয়ে দেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো। শেষ পর্যন্ত বিয়ে দিয়েই দিল একই গ্রামের আবু তাহেরের সাথে। শুরু হলো অন্য রকম জীবন। শেফালী তার জীবনের এ চড়াই উৎড়াই নিয়ে এখন খুব চিন্তা করে। জীবনের এত উত্থান-পতন, ভাঙ্গা-গড়া, প্রাপ্তি-বিসর্জন নিয়ে সে খুব চিন্তিত। যখন একা থাকে তখন ভাবে কেন এ কিছু দেখতে হলো তাকে? কেন এত বঞ্চনা, বিসর্জন আর না পাওয়া নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়?

ভাবনা চিন্তার এক পর্যায়ে শেফালী উপলব্ধি করে যে সে শুধু একাই না তার মতো আরো অনেকে এ সমাজে অবহেলিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত। এসব কথা চিন্তা করে আশেপাশে থাকা অন্যান্য নারীদের প্রতি তার একটা দরদ কাজ করে। এখন সে ভাবে নিজের জীবনের মতো আর কোন নারীকে যাতে পড়তে না হয়। কিন্তু কীভাবে এ নারীদের সে উদ্ধার করবে, তাদের এ অবস্থার উন্নয়ন করা কী তার পক্ষে সম্ভব? শেফালী এটা জানে যে অবহেলিত এ নারীদের উদ্ধার করতে হবে কিন্তু কীভাবে করবে সেটা সে জানে না। তাহলে এ সমস্যার সমাধান কী?

এমন সময় শেফালী হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ-এর একটা প্রশিক্ষণের খবর পায়। সে যে বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করছিল সেগুলো নিয়েই নাকি আলোচনা হবে এ প্রশিক্ষণে। অতঃপর সাংবাদিক স.ম. ইকবাল বাহার চৌধুরীর হাত ধরে ৩৯তম বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণের পর শেফালী যেন অন্ধকার মাঝে আলোর আভা দেখলো। শুরু হলো নতুন জীবন। আত্মপ্রত্যয়ের সাথে যুক্ত হলো নতুন প্রেরণা। প্রথমে ২০জনের একটা মহিলা দল গঠন করলো। দলের নাম দেওয়া হল মোঃ শাহ ঘোনা মহিলা সমবায় সমিতি। সমিতির সদস্যদের মাঝে প্রথমে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করার কাজটা হাতে নেয়া হয়। এরপর শুরু করে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কাজ। চলতে থাকে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, খোলা পায়খানা, স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং জন্ম নিবন্ধন বিষয়ে উঠান বৈঠক। বৈঠকগুলোতে গিয়ে শেফালী বেশ সাড়া পায়। বৈঠকগুলো করে এটা নিশ্চিত হয় যে নারীরা পরিবারের মধ্যে কোন না কোনভাবে নির্যাতন, নিপীড়নের শিকার।

এরপর শুরু হয় তার অন্যরকম পথচলা। এতদিন আলাপ আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাদের কাজ, এবার সেই বিষয়গুলো বাস্তবায়নের সময় এসেছে। জন্মনিবন্ধন দিয়ে শুরু করলো তারা। ইউনিয়ন পরিষদের সাথে স্বেচ্ছাসেবী কাজ হিসেবে ২১৪ জনের জন্ম নিবন্ধন করে ফেললো। গ্রামের আরেকটি বড় সমস্যা হলো যে এখানে স্যানেটারি ল্যাট্রিন এর পরিমান খুব কম, তাদের যৌথ উদ্যোগে তারা ৭টি স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন করল। কিন্তু যে সমস্যায় নারীদের সবচেয়ে বেশি ভুগতে হয়েছে তা হলো বাল্যবিবাহ। তারা একবার খবর পেল যে তাদের গ্রামে বাল্যবিবাহ হচ্ছে। তারা সেখানে ছুটে যায়, বাল্যবিবাহের কুফল বুঝানোর চেষ্টা করে। তারা ৫টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করে। যেমন মোহাম্মদ শাহ ঘোনা গ্রামে একবার বাল্যবিবাহের খবর পায় শেফালী সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে যায় সেখানে। এটি ছিল তোহা আখতার এর বিয়ে। একই গ্রামের শহীদা আক্তার এর বিয়েও তারা এভাবে বন্ধ করে। ২টি যৌতুকবিহীন বিয়ে সম্পন্ন করার জন্য তারা বেশ অবদান রাখে। তাদের গ্রামের আলম ইসলামের মেয়ে দিলদার বেগমের যৌতুকবিহীন বিয়ে বলা যায় তাদেরই অবদান।

শুধু সচেতনতামূলক কাজই নয় তারা তাদের সদস্যদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সমবায় সমিতির নামে ৩০ কড়া ধানি জমি বন্ধক নেয়। এখন তাদের সমিতির নির্দিষ্ট আয়ের উৎস আছে। এখান থেকে তারা অল্প করে হলেও অর্থ উপার্জন করছে।

ইতিঃপূর্বে সে, কালারমার ৪নং ওয়ার্ডের রেডক্রিসেন্ট-এর সিসিডি কমিটি'র দলনেত্রী নির্বাচিত হয়। সে মহেশখালী বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সভাপতির দায়িত্বে আছেন। ইউনিয়ন দুর্যোগ কমিটির সদস্যসহ ইউনিয়ন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। এরই মধ্যে ৪দিনের উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহন এবং মাসিক বিকশিত নারী সমন্বয় সভায় যোগ দিয়ে বহু আইনের বিষয় জেনে নেয়। সেই মোতাবেক কাজে প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিশ্ব নারী দিবস পালন সহ নারী মুক্তি আন্দোলনে অগ্রণী ভুমিকা পালন করছে মহিল সমবায় সমিতি। প্রথম দিকে তাকে সবাই কটাক্ষ করতো কিন্তু তার কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে সে এলাকার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। এখন আর সে একা নয়। সমাজে অনেক নারী পুরুষ তার আন্দোলনে শরিক হয়েছেন। সমিতির সদস্যদের নিয়ে এলাকার দরিদ্র পরিবারগুলোতে গিয়ে শিক্ষার গুরুত্ব বুঝানোর চেষ্টা করছেন। ৭জন শিশুকে স্কুলে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। নিরক্ষর নারীদের সাক্ষর জ্ঞান দানের জন্য তার জীর্ন কুটিরে সপ্তাহে ৩দিন বসে নারী শিক্ষা পর্ব। এতে করে অনেকেই এখন নিজের নাম স্বাক্ষর ও একটু আধটু পড়তে শিখছে।

কালারমার ছড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তির সময় উপবৃত্তি প্রাপ্তদের কাছ থেকে ১০/২০ টাকা করে কেটে নেয়া হতো। এ বিষয়টি প্রথমে শুধু ছাত্রছাত্রীরা জানতো এরপর তাদের বাবা মা জানে। সবাই জানতো কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করতো না। আবার কীভাবে করবে সেটাও তারা বুঝতো না। শেফালী গ্রামের লোকজনদের নিয়ে আন্দোলন করে তা বন্ধ করেছে। গ্রামের মানুষের সকল দাবিদাওয়া আর অভাব অভিযোগের পাত্র হলেন শেফালী। বিপদে পড়লে তাই তার কাছেই ছুটে আসছে তারা।

তথ্য সংগ্রহ ও রচনা: স.ম ইকবাল বাহার চৌধুরী।

জীবন সংগ্রামী মনোয়ারা বেগম

ছোটবেলা থেকেই বই পড়ার অদম্য স্পৃহা ছিল। এখন মনোয়ারা বেগম যখনই সময় পান তখনই বই পড়েন। এটা সে তার ভালোলাগা থেকে করে। আর সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে সমাজের পিছিয়েপড়া মানুষগুলোর সাথে থাকতে চান তিনি। তিনি বিশ্বাস করেন এরা পিছিয়ে থাকলে সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই প্রতিনিয়ত উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে একটি আদর্শ গ্রাম হিসেবে নিজের গ্রামকে দেখতে চান মনোয়ারা বেগম।

মানুষের ভালবাসার কারনেই নেত্রকোনা সদর পৌরসভার মহিলা কমিশনার নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৯৭ সালে। দুঃস্থদের নিয়ে সমবায় সংগঠনের জন্য ১৯৯২ সালে নেত্রকোনা জেলার শ্রেষ্ঠ সমবায় পুরষ্কার পান। বর্তমানে মনোয়ারা বেগম একটি কয়েল লাকড়ির মিল গড়েছেন। এতে ২৫ জন নারী পুরুষ কাজ করে যার প্রত্যেকে এখান থেকে ৩ থেকে ৪ হাজার টাকা রোজগার করে। সব খরচ বাদ দিয়ে মনোয়ারা বেগম প্রতি মৌসুমে ২৫ হাজার টাকার মত নিট লাভ থাকে। সম্প্রতি তিনি একটি মুরগীর ফার্ম চালু করেছেন। যেখানে ৫ জন নারী কাজ করছেন।

আদর্শ মা হিসেবেও মনোয়ারা বেগম সফল। বড় মেয়ে এম.এ পাশ করে পল্লী বিদ্যুতে চাকুরি করছেন, ছেলে অনার্স শেষ করে একটি বেসরকারি ফার্মে চাকুরি করছেন এবং সবার ছোট মেয়ে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা দিবে। বড় মেয়েকে ২০০৪ সালে এবং ছোট মেয়েকে সাম্প্রতিক সময়ে বিয়ে দিয়েছেন। সমাজ সংসার নিয়ে বলতে গেলে তিনি বেশ সুখেই আছেন। তার আজকের এই অবস্থা এখন যত সুখের মনে হয় তার অতীত কিন্তু মোটেই এমন ছিল না; বরং সংসারের তখনকার অবস্থাটা ছিল বেশ নাজুক। অনেক কন্টকাকীর্ন পথ পেরিয়ে তারপর আজ এ জায়গায় আসতে পেরেছে।

মনোয়ারা বেগম চার ভাই বোনের মধ্যে দ্বিতীয়। বাবা মোঃ ওয়াফিজুদ্দিন '৬৬ সালে যখন বগুড়ায় জুট ইন্সপেক্টর হিসেবে কর্মরত তখন মনোয়ারা বেগম জন্মগ্রহন করেন। মা শামছুন নাহার আদর করে নাম রাখেন বকুল, এ নামেই এলাকায় তার পরিচিতি। তবে মনোয়ারা বেগমের বেড়ে উঠা নেত্রকোনা জেলার মালনী নামক গ্রামে । নেত্রকোনা জেলার সদর থানায় শহর থেকে ২ কিলোমিটার পূর্বে এই গ্রাম। গভঃ গার্লস হাই স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেনীতে পড়ার সময় মাকে হারান। মনোয়ারা বেগম জাহানারা মেমোরিয়াল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে ১৯৭৩ সালে এসএসসি পাশ করেন। এস. এস.সি পাশের পরের বছরই আটপাড়া দেউগাঁও গ্রামের আজিজুর রহমান খানের সাথে বিয়ে হয়। আজিজুর রহমান পেশায় চাকুরিজীবি ছিলেন।

মনোয়ারা বেগম ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখতেন বাংলায় উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করবেন। কিন্তু বিয়ে হয়ে যাওয়ার কারণে সেই আশা ফিকে হয়ে যায়। তবুও মনোয়ারা বেগম দমার পাত্র নন, ছেলে মেয়েদের মানুষ করার পাশাপাশি লেখাপড়া চালিয়ে যেতে থাকেন। '৮১ সালে এইচএসসি পাশ করেন। লেখাপড়ার বিষয়ে তার স্বামীর অনুপ্রেরণা সব সময়ই ছিল। '৯৮ সালে নেত্রকোনা পিটিআই হতে পিটিআই ট্রেনিং এবং ২০০০ সালে শর্ট হ্যান্ডস কোর্স সম্পন্ন করেন। স্বামীর বাড়ীতে তিন বছর অতিবাহিত করার পর স্বামী সন্তানসহ মায়ের ওয়ারিশ সূত্রে পাওয়া জমিতে বাড়ি বানান। ভালভাবেই দিন যাচ্ছিল বকুল আপার কিন্তু বিধিবাম এত সুখ তার কপালে সইলো না। ১৯৯৩ সালের ২৪শে জানুয়ারীতে অকালেই স্বামীকে হারিয়ে অথই সাগরে পড়েন। স্বামী মারা যাওয়ার পর সংসারে নিদারুন আর্থিক অনটন শুরু হয়। এতে হতাশ না হয়ে ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্য জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হন বকুল।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় তিনি মৌচাষের উপর প্রশিক্ষণ নেন। অতঃপর ১০ জন দুঃস্থ মহিলাকে নিয়ে 'মালনী দুঃস্থ নারী সমিতি' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা শতাধিক। সেই সংগঠন থেকে মৌচাষের প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করে। এরপর শখের বসে একটি বক্সে মৌ চাষ শুরু করেন। প্রথমে দুইটি

দিয়ে শুরু করে পরে দশটি বক্স করেন। এতে তার প্রতি মৌসুমে ২০ হাজার টাকা আয় হতো। মৌচাষের পাশাপাশি তিনি মাছের চাষ শুরু করেন। নারী হিসেবে এই সব কাজ করতে তিনি কখনও কুণ্ঠাবোধ করেননি। তবে তার চারপাশ থেকে বিভিন্ন কথা শুনতে পেত। তাকে নিয়ে কানাঘষা চলতো এটা সে ভালোভাবেই বুঝতো। মনোয়ারা বেগম-এর মন প্রায়ই খারাপ থাকতো। সে ভাবতো গ্রামের সব পুরুষ তো জীবিকা নির্বাহের জন্য এমন কাজ করে সে ও তাই করে, তাহলে কেন তাকে এত সমালোচিত হতে হবে। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণটা জরুরি। কিন্তু কীভাবে হবে। নারীরা তো নারীর কষ্ট বোঝে তারা আসলেই তো সব সমস্যা সমাধান হয়ে যেত।

এরপর উজ্জীবক সালমা আক্তারের কাছে প্রথম হাঙ্গার প্রজেক্ট সমন্ধে শুনে পরে নেত্রকোনা অঞ্চলের সমন্বয়কারী সুশান্ত সরকারের সাথে পরিচিত হন। ২০০৬ সালে বিকশিত নারী শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সের ৭ম ব্যাচের প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন এবং পরবর্তীতে ২০০৭ এর জুলাই মাসে১২০৮ তম ব্যাচের উজ্জীবক প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণটি নেত্রকোনা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ দু'টি নেওয়ার পর মনোয়ারা বেগমের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং পিছিয়েপড়া নারীদের জন্য কিছু করার জন্য তাগিদ অনুভব করেন। স্থানীয়ভাবে দক্ষতাবৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণ, কুটির শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে নারীদের কর্মমুখী করে একটি কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। এরপর উপজেলা পশুসম্পদ এর অধীনে হাঁস মুরগী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছিলেন এবং তাদের ঋণেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। যারা প্রশিক্ষণ নিয়েছিল তারা আজ সবাই স্বাবলম্বী। বয়স্ক ও হতদরিদ্র ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য গণশিক্ষার মাধ্যমে তিনি এলাকায় শতভাগ সাক্ষরতা নিশ্চিত করেন। এখনও তিনি দুঃস্থ শিশুদের নিয়ে গণশিক্ষা কার্যক্রমটি চালিয়ে যাচ্ছেন। সমাজে সকলের পাশে থাকেন বলেই বকুল আপা জনপ্রিয়। কারণ সকল কাজেই বকুল আপাকে কাছে পাওয়া যায়।

এখন বকুল আপার আর পিছন থেকে কথা শুনতে হয় না। তার এখন একটা সামাজিক অবস্থান আছে। বকুল আপা এখন আপসোস করে যে আগে যদি আমি এ বিষয়টা বুঝতাম যে মানুষের পাশে দাঁড়ালে সে-ই একদিন আমাকে রক্ষা করবে তাহলে আরো অনেক আগেই সাফল্যের মুখ দেখতাম। সমাজের জন্য কাজ করলে সমাজের মানুষই তার নিরাপত্তা দেয়।

আমি বিশ্বাস করি নারীরা যদি মনোয়ারা আপার মত প্রত্যয়ী হয় তাহলে আমাদের সমাজের চিত্রটাই পাল্টে যাবে যা নতুন দিগন্তের সূচনা হবে। যা কিনা ক্ষুধামুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

তথ্য সংগ্রহ ও রচনা: সানিয়াত রহমান।

নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত প্রাণ আমেনা বেগম

আমাদের দেশে প্রতিনিয়ত নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছেই। নারী নির্যাতন স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। "পুরুষরা নারীদের নির্যাতন করবে আর নারীরা তা সহ্য করবে"- এটাই যেন নিত্যদিনের ছবি। কিন্তু এই ছবি চিরতরে মুছে ফেলতে হবে। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, গড়ে তুলতে হবে তীব্র আন্দোলন। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যে সকল নারীরা প্রতিনিয়ত নির্যাতনের শিকার হন তাদের ন্যায্য অধিকার সমাজে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার ব্রত নিয়েই আমি কাজ করে যাচ্ছি – একথাগুলো একজন সংগ্রামী নারী আমেনা বেগমের। প্রত্যন্ত গ্রামে থেকেও শোষণের বিরুদ্ধে যিনি সোচ্চার।

আমেনা বেগমের জন্ম নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার খিয়ার জুম্মা গ্রামে ১৯৭৮ সালে ১২ মে। তিন ভাই ও পাঁচ বোনের মধ্যে আমেনা দ্বিতীয়। বাবা একজন ব্যবসায়ী এবং মা গৃহিনী। খিয়ার জুম্মায় বাবার ৩০ বিঘা চাষযোগ্য জমি, সমিল, ইট ভাটা, তন্দুর কারখানা, রাইচ মিল। এক কথায় বলা যায় স্বচ্ছল ও রক্ষণশীল পরিবারে আমেনা বেগমের জন্ম হয়। পারিবারিকভাবেও এলাকায় তাদের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। তাঁর বাবা একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা। ৬নং সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। এলাকার সকল মহলে শ্রদ্ধার পাত্র। একজন সমাজ কর্মী ও সংগঠক হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম আছে। কারো কোনো বিপদ হলেই তিনি এগিয়ে যেতেন, সমস্যার সমাধান করতেন। দরিদ্র মানুষের লেখাপড়ার জন্য তিনটি মাদ্রাসা, এতিমখানা ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন করেছেন।

শিশুকাল থেকেই আমেনা ছিলেন দুরন্ত, ডানপিটে ও প্রতিবাদী। অন্যায়ভাবে তাকে কিছু বলা হলে বা মারলে তিনি সাথে সাথেই প্রতিবাদ করতেন। অন্যের দু:খে কাতর হতেন। নিজের পোশাক দিযেও দরিদ্রদের সহযোগিতা করতেন। নানীর কাছে টাকা নিয়েও অন্যকে সাহায্য করেছেন।

আমেনা বেগমের শিক্ষাজীবন শুরু হয় খয়ার কাজীপাড়া স্কুল এন্ড কলেজে। মেধাবী ছাত্রী না হলেও মোটামুটি ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করতেন। স্বপ্ন দেখতেন লেখাপড়া শেষ করে চাকুরী করবেন, নিজের প্রযোজনীয় জিনিষ নিজেই কিনবেন। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন পূরণ হয়নি। ১৯৯৩ সালে ৯ম শ্রেণীতে অধ্যায়নকালেই বাবা তার বিয়ে দেন, বিয়েটা তার জন্য মঙ্গালজনক ছিল না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়েটা হয়েছে। মতামতের কোন মূল্য দেয়া হয়নি, আমার স্বামী রুহুল মোকাররম মন্ডল ছিলেন সয়ার মন্ডল পাড়ার বাসিন্দা। তার বড় ভাই আমার বাবার সাথে ব্যবসা করতেন। ১৯৯২ সালে এস.এস.সি. পাশের পর মাঝে মধ্যেই বড় ভাইয়ের ব্যবসা দেখতেন। তখনই আমার বাবার সাথে তার পরিচয় হয়। পরিচিত ও ভালো ছেলে বিবেচনা করে বাবা বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। বাবা আমাকে নানা বাড়ি থেকে খিয়ার জুম্মায় বেড়ানোর জন্য নিয়ে আসেন। তখনও আমি বিয়ের ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। যখন জানতে পারি, পালিয়ে নানার বাড়িতে চলে আসি। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। বাবা এসে অনেক বুঝিয়ে বিয়ের পরও লেখাপড়া করতে পারবো -এমন আশ্বাস দিয়ে, নানা-নানীর অমত থাকা সত্ত্বেও সাথে করে নিয়ে আসেন এবং আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিয়ে দিয়ে দেন।

বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে যৌথ সংসারে আমেনার সাংসারিক জীবন শুরু হয়। পারিবারিক অশান্তি স্বত্ত্বেও তিনি লেখাপড়া শুরু করেন। দশম শ্রেণীতে ভর্তি হন। কিন্তু শ্বশুর বাড়ির লোকজন এটাকে ভালোভাবে মেনে নেননি। সাংসারিক মনোমালিন্যের কারনে তিনি বাবার বাসায় চলে যান। বাবা তারাগঞ্জে নিজস্ব জমিতে থাকার ব্যবস্থা করে দেন এবং একটি মুদির দোকান করার ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতা করেন। ১৯৯৫ সালে প্রথম কন্যা সন্তান জন্মের পর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় আমেনার।

বিয়েটা তার সুখের ছিল না। তার স্বামীর আর্থিক অবস্থা ভালো থাকলেও তিনি সম্পদ ধরে রাখতে পারেননি। জুযা খেলে প্রায় সব সম্পত্তি বিক্রি করেছেন। এর ফলে পরিবারে নেমে আসে আর্থিক দৈন্যতা, অনেক সময় না খেয়ে

থাকতে হয়েছে। এর মধ্যেই ১৯৯৭ সালে দ্বিতীয় পুত্র সন্তান ও ২০০২ সালে তৃতীয় পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচ এ দাঁড়ায়। সে অনুপাতে আয় বাড়ে না। এমতাবস্থায় তারাগঞ্জের দোকান বিক্রি করে দিয়ে পুনরায় সয়ার মন্ডল পাড়া গ্রামে ফিরে আসেন। জীবিকার তাগিদে এখানেও একটি মুদি দোকান দেন। কিন্তু খারাপ অভ্যাসের কারণে অভাব নিত্যদিনের সঙ্গী হযে দাঁড়ায়। আমেনার বাবা ২০০৩ সালে মারা যান। জীবিত থাকাকালীন সময়ে একাধিকবার তাকে সংসার ত্যাগ করে চলে যাওয়ার জন্য নিতে এসেছিলেন আমেনার বাবা। অন্যত্র বিয়ে দিবেন এমন প্রস্তাবও করেছেন। কিন্তু আমেনা সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছেন।

অসময়ে এবং অপাত্রে বিয়ে আমেনার জীবনটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সব আশা-আকাঙ্খা অংকুরে বিনষ্ট হয়েছে এ কারণে বাবার প্রতি তার তীব্র ক্ষোভ ছিল। বাবার বাড়িতে ফিরে যাওয়া, ভাইদের কাছে আর্থিক সাহায্য নেয়াকে তিনি অসম্মানজনক মনে করতেন। স্বামীকেই ভালো পথে আনার জন্য সচেষ্ট হলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না দেখে তিনি জীবন বাঁচানোর তাগিদে কাজের সন্ধান করতে থাকেন।

সেলাই এর কাজ জানতেন। বাবার দেয়া সেলাই মেশিন দিয়েই বাড়িতে দর্জির কাজ শুরু করেন। গ্রামে গ্রামে, বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাজের অর্ডার নেন। এখানেও একাধিকবার বাধা পেযেছেন, অপবাদ শুনেছেন, স্বামীর আত্মসম্মানে আঘাত হানছে এমন কথাও শুনেছেন। কিন্তু তাতে তিনি দমে যাননি। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ করেননি। মেয়ে দশম শ্রেণীতে, বড় ছেলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে এবং ছোট ছেলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ছে। অনেক প্রতিবন্ধকতা, বাঁধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি সেলাই এর কাজ বন্ধ করেননি।

বেসরকারী সংস্থা "রিক"এর সেলাই প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উজ্জীবক এবং স্বেচ্ছাব্রতী প্রশিক্ষক পারভীন আক্তারের সাথে তার পরিচয় হয়। পারভীন আক্তারের কাছেই উজ্জীবক প্রশিক্ষণের বিষয়ে জানতে পারেন। নারীদের মানসিক এবং অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে সয়ার কাজীপাড়ায় একটি উজ্জীবক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন আমেনা। নয়টি ওয়ার্ড থেকে ৮০ জন নারী নিয়ে ২০১০ সালে ১৪-১৭ ফেব্রুয়ারী সয়ার কাজীপাড়া স্কুল এন্ড কলেজে ১৬০০তম ব্যাচে চারদিনব্যাপি উজ্জীবক প্রশিক্ষণে একাধারে আয়োজক ও অংশগ্রহণকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

চারদিনের এই প্রশিক্ষণে তিনি নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেন। প্রশিক্ষণে নারীর ক্ষমতায়ন আলোচনাটি আমেনাকে আকৃষ্ট করে। আমেনা বলেন, প্রশিক্ষণের অনেক পূর্ব থেকেই তিনি নির্যাতিত নারীদের বিভিন্ন অধিকার আদায়ে কাজ করতেন কিন্তু তা ছিল অনেকটাই অগোছালো। প্রশিক্ষণের পর এই কাজগুলোকে পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে নিচ্ছেন। এর ফলে এলাকায় সকলের সাথে তার সম্পৃক্ততা বাড়ছে। এছাড়াও আদর্শ গ্রাম, আত্মশক্তি, আত্মনির্ভরশীলতাসহ দশটি নীতি, জ্ঞানের রাজ্য ইত্যাদি সেশনগুলো তার মনোবল ও চেতনাকে আন্দোলিত করেছে। প্রশিক্ষণের পরেই ২৪ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে একটি সভার মাধ্যমে ৮০ জন উজ্জীবককে নিয়ে "জাগ্রত নারী সংগঠন" তৈরি করেন। সংগঠনের বর্তমান সঞ্চয় ৯,০০০ টাকা।

আমেনা তার কার্যক্রমকে শুধুমাত্র জনসচেতনতা সৃষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। এলাকায় নারী নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ হচ্ছে- একথা শোনামাত্রই তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে তা বন্ধের চেষ্টা করেন। তিনি সর্বদাই অন্যের সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করতেন। তার প্রতি এক ধরনের ভরসা বা নির্ভরশীলতা তৈরি হয়েছে জনগণের। সবাই তাকে ভালোবাসে। তার কর্ম উদ্দীপনা এবং সেবাব্রতী মন দেখে তারাগঞ্জ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাকে সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। তিনি নিজে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং এলাকার নারীদের প্রতি ব্যাচে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিচ্ছেন। এছাড়াও প্রশিক্ষণ শেষে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে, স্কুল এমনকি ব্যক্তিগতভাবেও সেলাইয়ের অর্ডার পাওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছেন, এভাবে অনেক নারী কর্মসংস্থানও হয়েছে।

আমেনা বেগম আত্ম উন্নয়ন আর সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদানের মধ্যে তাঁর কাজকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। এলাকার উজ্জীবকদের সহায়তায় সয়ার ইউনিয়নের প্রায় গ্রামেই নারীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে উঠান বৈঠক, সভা, ক্যাম্পেইন ও সমাবেশের আয়োজন করে চলেছেন। সভাগুলোতে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠানো, বয়স্ক শিক্ষা, বাল্যবিবাহের কুফল, মাতৃস্বাস্থ্য, গর্ভবতী মা ও শিশুর পুষ্টিকর খাবার, নিয়মিত চেকআপ করা, টিকা নেয়া, জন্ম ও বিবাহ নিবন্ধন, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, বৃক্ষরোপণ, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, যৌতুকের অভিশাপ, পারিবারিক নারী নির্যাতন বন্ধ করা এবং সংগঠন তৈরির প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ের উপর নিয়মিত আলোচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ফলোআপ করছেন। এছাড়াও এলাকায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস, জাতীয় কন্যাশিশু দিবস, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবসসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবসগুলো সকলের সহযোগিতায় উদযাপনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

মলিনা খাতুন সয়ার মন্ডল পাড়ার একজন বাসিন্দা। প্রশিক্ষণের পর ঋণ নিয়ে সেলাই মেশিন কিনেছেন। তার মাসিক আয় বর্তমানে ২৫০০ থেকে ২৭০০ টাকা। সেলাই এর উপার্জন থেকে ঋণ পরিশোধ করেছেন। আমেনা বেগম কুর্শা পঞ্চায়েত পাড়ার বাসিন্দা। পরিবারের সদস্য সংখ্যা তিনজন। স্বামী মারা গেছেন, পরিবার প্রধান হিসেবে ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ দিয়েও মাসিক ৩০০ টাকা সঞ্চয় করেন, তার মাসিক আয় ৪০০০ টাকা। সালমা বেগম সয়ার কাজী পাড়ার বাসিন্দা। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা পাঁচজন। তার মাসিক আয় ৩০০ টাকা। সেলাইয়ের টাকা থেকে ছেলেমেয়ের পড়ার খরচ চালাচ্ছেন। মেয়ে এস.এস.সি. পরীক্ষা দিচ্ছে, ছেলে ক্লাশ ফাইভে পড়ছে। মাসে ২০০ থেকে ৩০০ টাকা সঞ্চয় করছেন। হাসিনা বানু সয়ার মাজা পাড়ার বাসিন্দা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা চারজন। পিঠা বিক্রয় করে প্রতিদিন আয় করেন ৭০/৮০ টাকা, যা সংসারের খরচ চালাতে সহযোগিতা করছে। আলেয়া খাতুন সয়ার মাজা পাড়ার বাসিন্দা, পরিবারের সদস্য সংখ্যা চারজন। মুদির দোকান দিয়েছেন, দৈনিক আয় ১৫০/১৭০ টাকা। মেয়ের লেখাপড়া ও সংসার খরচে সহযোগিতা করছেন। হুমায়রা বেগম সয়ার মন্ডল পাড়ার বাসিন্দা, স্বামী বেঁচে নেই। তিনিই পরিবার প্রধান। পরিবারের সদস্য সংখ্যা চারজন, তিনজন ছেলে। বড়ছেলে ১০ম শ্রেণী, মেঝো ছেলে ৬ষ্ঠ শ্রেণী ও ছোট ছেলে ৫ম শ্রেণীতে সয়ার কাজী পাড়া স্কুল এন্ড কলেজে লেখাপড়া করছে। মুদির দোকানে তিনি নিজেই কেনাবেচা করেন। দৈনিক আয় হয় ১৫০ থেকে ২০০ টাকা, যা দিয়ে সংসারের খরচ ও লেখাপড়ার খরচ চালান।

আমেনা বেগম উজ্জীবক এবং এলাকার জনগণের সহযোগিতায় ডালিয়া ক্যানেলের ধারে ২০০টি বনজ ও ফলজ গাছ লাগিয়েছেন। ১০টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করেছেন। ৩টি যৌতুক বিহীন বিবাহ দিয়েছেন। স্কুলে ভর্তি হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন ২৫জন মেয়ে ও ৩০ জন ছেলেকে। তার উদ্যোগে আয়মূলক কর্মসংস্থান হয়েছে ২০জন উজ্জীবকের।

উজ্জীবকদের সহযোগিতায় ৬টি সংগঠন তৈরি হয়েছে :

ক্রম	নাম	সদস্য সংখ্যা	সঞ্চয়
১.	সয়ার মন্ডল পাড়া নারী উন্নয়ন সমিতি	২২	৬০০
২.	সয়ার ডারার পাড়া মহিলা সমিতি	১৭	২০০
৩.	সয়ার বামন পাড়া উজ্জীবক সমিতি	১৫	২৫০
৪.	সয়ার কলেজ পাড়া উন্নয়ন সমিতি	১৫	২০০
৫.	সয়ার চেংপাড়া উন্নয়ন সমিতি	৩৬	৬০০
৬.	হাজির হাট নারী উন্নয়ন সমিতি	১০	২০০

সংগঠনের কার্যক্রম আরও গতিশীল এবং সেই সাথে নারীদের মধ্যে পারস্পারিক সম্পৃক্ততা বাড়াতে তিনি সরকারীভাবে সংগঠনের নিবন্ধন করার বিষয়টি ভাবনার মধ্যে রেখেছেন। সংসারের চাহিদা মেটানোর জন্য আমেনা বেগম এখন ফারইস্ট ইসলামী বীমা কোম্পানীতে কাজ করছেন। তার গ্রাহক সংখ্যা ১৫০জন। উল্লেখ্য যে আমেনা একজন সফল

নারী। চেষ্টা ও আন্তরিকতা দিয়ে তিনি স্বামীর ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছেন। ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতে মাথা গুঁজার ঠাই হিসেবে বাস্তভিটা নিজের নামে লিখে নিয়েছেন। ভাইদের সাথে পরামর্শ করে বড় ভাইয়ের ইটভাটায় স্বামীর ম্যানেজার পদে চাকুরীর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, দু'জনের আয়ে মোটামুটিভাবে সংসারের খরচ চলে যাচ্ছে।

আমেনা তাঁর সংগ্রামী জীবনটাকে মানবসেবায় উৎসর্গ করতে চান। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও নারী উন্নয়নে কাজ করে যেতে চান। যদিও জানেন, এসব কাজে রয়েছে হাজারো বাঁধা, প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু, তিনি দৃঢ়তার সাথে সকল বাঁধা অতিক্রম করে তার মুক্তিযোদ্ধা বাবার সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রুপ দেয়ার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাবেন, এটাই তার অঙ্গীকার। আমেনার স্বেচ্ছাব্রতী জীবন অর্থপূর্ণ হোক, তাঁর চেতনার স্পর্শে জেগে উঠুক হাজারো নারী– গড়ে উঠুক সমতার সুন্দর বাংলাদেশ।

তথ্য সংগ্রহ ও রচনা: শামীমা রহমান।

আপন শিল্পকর্মে আলোকিত নেত্রকোনার শিল্পী

নেত্রকোনা জেলা – ভারতের মেঘালয় রাজ্য ও গারো পাহাড়ের পাদদেশে এর অবস্থান। এই জেলার পূর্বে সুনামগঞ্জ জেলার টাঙ্গার হাওড়, দক্ষিনে কিশোরগঞ্জ ও পশ্চিমে ময়মনসিংহ। গারো পাহাড় থেকে নেমে এসেছে সুরেশ্বরী, কংশ, জয়ন্তা ও মগড়া নদী। নয়নাভিরাম এই সৌন্দর্যের আবাসভূমির মুক্তারপাড়ায় জন্ম নাছিমা আক্তার খানম শিল্পীর। মুক্তারপাড়া গ্রামটির মাঝদিয়ে বয়ে গেছে মগড়া নদী। মগড়া নদী নেত্রকোনা শহরকে দ্বীপের মত চারদিকে ঘিরে আছে। এ নদীর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, বর্ষাকালে নদী পূর্ণ যৌবনে থাকে কিন্তু শীতকালে পানি শুকিয়ে নদী মরে যায়। যার জন্য একে মগড়া নদী বলা হয়। শিল্পীর বাবা ঠিকাদারী ব্যবসায়ী আব্দুর রহমান এবং মা সুলতানা রাজিয়া। ১৯৭৮ সালের মে মাসের এক শুভক্ষণে মায়ের কোল জুড়ে পৃথিবীতে আসেন প্রথম কন্যা সন্তান শিল্পী। পুত্র সন্তানের আশায় আশায় শিল্পীর বাবা-মা একে একে ছয় কন্যার জন্ম দেন। বাবার একাত্ম আয়ে পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা কালক্রমে নাজুক হতে থাকে এবং এর প্রভাব পড়ে চঞ্চল, বাগপটু মেধাবী ছাত্রী শিল্পীর উপর।

শিল্পী স্কুলে পড়াশুনা করে, খেলাধুলা করে বড় হতে লাগলো সবার সাথে। কিন্তু পরিবারে অনেক কন্যা সন্তান থাকায় মামা, চাচা ও পরিবারের অন্য সদস্যরা মিলে অল্প বয়সেই ১৯৯২ সালে শিল্পীকে নেত্রকোনা জেলা শহর থেকে ১০ কিলোমিটার উত্তরে ঠাকুরাকোনা গ্রামের বনেদী পরিবারের ছেলে আক্কাছ আলীর সাথে বিয়ে দিয়ে দিলো। শিল্পী তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় বিয়ে হওয়ার পর সাধারণত মেয়েদের আর লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয় না। শ্বশুরালয়ের নেতিবাচক প্রভাব উপেক্ষা করে শিল্পী লেখাপড়া চালিয়ে যেতে থাকেন। অনেক বাধা-বিপত্তি সত্বেও বাবা আব্দুর রহমান খানের সহযোগীতায় ২০০৬ সালে এসে ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন শিল্পী।

শিল্পীর এ পথচলাটা মসৃন ছিলনা। শিল্পী লেখাপড়া করুক এটি শ্বশুরবাড়ীর কেউ চায়নি, এমনকি স্বামী স্বয়ং এ বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি। শাশুড়ী বলতেন বাড়ীর বউ লেখাপড়া করে কি করবে। বউ হবে সংসারী। শিল্পী সকল প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে লেখাপড়া চালিয়ে গেছেন। লুকিয়ে লুকিয়ে রাতের বেলায় পড়াশুনা করেছেন। শিল্পী তার ভবিষ্যত প্রজন্মদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করবেন, এ কথা চিন্তা করে নেত্রকোনা শহরের মুক্তারপাড়ায় বসবাস শুরু করেন। শিল্পী সেই সময় থেকে নিজের পড়ালেখাকে চালিয়ে নেওয়ার জন্য এবং নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য কিছু কিছু হাতের কাজ করে উপার্জন করা শুরু করলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে শিল্পীর কোন ধরনের প্রশিক্ষণ ছিলনা কিন্তু পরে এই কাজটি ভালভাবে করার জন্য প্রতিবেশী আফছার আলীর সহযোগীতায় ১৯৯৮ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে কাটিং এন্ড হ্যান্ডি ক্রাফ্ট এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ছোট পরিসরে শুরু করেন আয়বৃদ্ধিমুলক কর্মকান্ড।

উজ্জীবক শাহিন আক্তারের সাথে একদিন দেখা শিল্পীর। জানতে পারেন আত্মনির্ভরশীল মানসিকতা এবং আত্মনির্ভরশীল জনপদ গড়ার প্রচেষ্টায় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর কর্মকান্ড সম্পর্কে। সংগঠনের নীতি, আদর্শ অনুধাবন করে শিল্পী নিজের জীবনের সাথে এর মিল খুজে পান। শিল্পী আগ্রহী হন উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের। তিনি ২০০৫ সালের ২৪-২৭ মার্চ এ নেত্রকোনা জেলা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিতব্য ৬৪৯তম ব্যাচে উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন এই প্রশিক্ষণটি তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। প্রশিক্ষণে আত্মনির্ভশীলতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার আলোচনা তার মনে বেশ দাগ কেটেছে। সে আগে ভাবতেই পারতো না নারী হয়েও কিভাবে সামাজিক দ্বায়বদ্ধতার ঋণ কিভাবে শোধ করা যায়। তিনি এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শিখতে পেরেছেন কিভাবে তিনি গ্রামের অন্যান্য নারীদের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারেন।

উজ্জীবক প্রশিক্ষণের পরবর্তী সময়ে শিল্পী স্থানীয়ভাবে নারীদেরকে সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মিটিং, উঠান বৈঠক, সমাবেশ, র‍্যালী, সচেতনতা সৃষ্টিমুলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন প্রতিনিয়ত। এইভাবে তার নেতৃত্বে একটি

সামাজিক নেটওয়ার্ক তৈরি হতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় সাভার জাতীয় যুব উন্নয়ন কেন্দ্রে ৩-৭ জুন ২০০৭ এ দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উচ্চতর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স করেন শিল্পী। প্রশিক্ষণের পর এলাকায় তার উদ্যোগ এবং আয়োজনে ৩টি উজ্জীবক প্রশিক্ষণ এবং ৩৫টি দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

অন্যান্য উজ্জীবকদের সাথে নিয়ে নিজস্ব এলাকায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সক্রিয় এবং সোচ্চার হন তিনি। তার বুদ্ধিদীপ্ত এবং সাহসী প্রচেষ্টায় লিনা, সেলিনা আক্তার, আঁখি আক্তার ও মিলনসহ ২০ জনেরও অধিক বাল্যবিবাহরোধ হয়েছে। ৭টি যৌতুক বিহীন বিয়ের ব্যবস্থা করেছে উজ্জীবকগণ। নারী নির্যাতনরোধে তিনি নেত্রকোনায় একটি বলিষ্ঠ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

শিল্পী বলেন আমি ছোট পরিসরে কাজ করতাম, কখনও বড় পরিসরের কথাও চিন্তা করতে পারিনি। উজ্জীবক প্রশিক্ষণের পরে নিজের মধ্যে সেই আত্মবিশ্বাসটা গড়ে উঠে। নিজের মধ্যে জড়তা ছিল এবং ছিল অনেক সীমাবদ্ধতা। প্রশিক্ষণ আমাকে বদলে দিয়েছে। বদলে দিয়েছে আমার জীবন যাত্রার মান। একজন নারী যেখানে ভাবতে পারে না যে সে পরিবার ও সমাজের জন্য অবদান রাখতে পারে। আমি বর্তমানে যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি তা এই উজ্জীবক প্রশিক্ষণই আমাকে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

শিল্পী উজ্জীবক প্রশিক্ষণ করে তা নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি সেলাই ও কুটির শিল্পে পারদর্শী ছিলেন। শিল্পী অন্যদেরও এই বিষয়ে পারদর্শী করে তুলে তাদের নিয়ে নিপুন হ্যান্ডি ক্র্যাফট্স নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ২০ জন নারী এবং নিজের জমানো সৎসামান্য পুঁজি সম্বল করে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু করেন। তারপর ধীরে ধীরে পথচলা। বর্তমানে ৩০০ জন নারী এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। প্রত্যেকে এখান থেকে মাসে গড়ে ৩০০০ থেকে ৪০০০ টাকা আয় করছে। শিল্পী নিজে যেমন লাভবান হচ্ছে তেমনি অন্যরাও এর মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে।

শিল্পী প্রথমে নারীদের নিজে প্রশিক্ষণ দেন পরে তাদেরকে তার প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ করে দেন। তিনি সেলাই এবং কুটির শিল্পের উপর ৩৫টি প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করে নারীদেরকে দক্ষ করে তুলেছেন। তিনি নিজ উদ্যোগে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্টের আয়োজনে এই প্রশিক্ষণগুলো করিয়েছেন। তিনি বলেন, তার মাধ্যমে প্রায় ১৫০০ জনের মত নারী প্রশিক্ষিত হয়েছেন। শিল্পীর কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেক নারী আজ তাদের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন করেছে এবং অনেক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। চল্লিশা ইউনিয়নের পারভীনের কথা ধরা যাক। পারভীন তার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে চল্লিশা ইউনিয়নের বাগড়া গ্রামে ২৫০ জন নারীকে সম্পৃক্ত করে কুটির শিল্পের কাজ করছে। তাদের এসব পন্য ঢাকার মীরপুর, মোহাম্মদপুর এবং আজিজ সুপার মার্কেটের বিভিন্ন বড় বড় শোরুমে সরবরাহ হয়ে থাকে। এছাড়াও এসব পণ্য দেশের বাহিরেও যায়। পারভীনের মত চল্লিশার মদিনা ২০ জন মহিলা নিয়ে ছোট পরিসরে কাজ করছেন। তিনি আরও বললেন তার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে কাইলাটির শিউলী, আনন্দ বাজারের তহুরাসহ ৩০জন এর বেশী নারী নিয়ে কাজ করছে। এরকম শেফালী, সালমা, কুসুম, নাজমাসহ আরও অনেকেই আছে যারা আজ তার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত হয়ে নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছে, আয় উপার্জন করছে।

নিপুন হ্যান্ডি ক্র্যাফট্স এর পণ্য এখন কানাডায় রপ্তানী হচ্ছে। শিল্পীর ছোট বোন সাদিয়ার কানাডার বন্ধু পুষ্পর মাধ্যমে কানাডা থেকে প্রথম অর্ডারটি আসে। প্রথম কাজের অর্ডার থেকেই ৩০ হাজার টাকা মুনাফা হয়। তার পর ধীরে ধীরে পথ চলা, আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। শিল্পী বলেন বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানের পণ্য কানাডা ও ইটালীতে রপ্তানী হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, কানাডায় বসবাসরত তার আত্মীয়ের মাধ্যমে অর্ডারকৃত পণ্য ৫০% উচ্চ মূল্যে সরবরাহ করেন। বছরে এ রকম দুটি অর্ডার পাওয়া যায় যা থেকে বছরে আনুমানিক ৫০ হাজার টাকা মুনাফা হয় শিল্পীর।

শিল্পী ঢাকায় একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নিটল হ্যান্ডি ক্রাফট্স প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট থেকে ক্রিষ্টাল ও মোমের কাজ এবং ময়মনসিংহ থেকে ব্লক বাটিকের কাজের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে দিনে দিনে নিজের প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধন করছেন। তার স্বপ্ন এই প্রতিষ্ঠানটি আরো বড় হবে এবং এলাকার আরো অনেক নারী তাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে।

নেত্রকোনা জেলায় দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ছাড়াও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কাজ করছেন। তিনি স্থানীয় জনসাধারণকে সচেতন করতে নিয়মিত ক্যাম্পেইন ও উঠান বৈঠক করেন। বিশেষ করে বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও স্বাস্থ্য সচেতনতার ওপর বেশি ক্যাম্পেইন ও উঠান বৈঠক করেন। তার এলাকায় এখন সবাই স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রথার কুফল সম্পর্কে জানে। এখানে বাল্য বিবাহ হয় না। শিল্পীর অল্প বয়সে বিয়ে হলেও পরে তার ছোট বোনগুলোর পড়াশুনা শেষ করে পরিণত বয়সে বিয়ে হয়। শিল্পী পরিবারের আত্মীয় স্বজনদের ধারণাকে মিথ্যা প্রমানিত করতে পেরেছেন বলেই বোনদের অল্প বয়সে বিয়ে হয়নি। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ কোনো ধরনের সমস্যায় পড়লে তার কাছে ছুটে আসে। সমাজে তার একটা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে। সকলের কাছেই আজ শিল্পী প্রিয়জন।

শিল্পীর স্বামী ঢাকার একটি বেসরকারী ফার্মে বর্তমানে চাকুরী করেন। তাদের দুটি সন্তান। বড় মেয়ের নাম হচ্ছে স্পর্শা ও ছোট ছেলের নাম রোহাত। শিল্পীর ইচ্ছা ছেলেমেয়েদের উপযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করাবেন। বড় মেয়ে বর্তমানে ৫ম শ্রেণীতে পড়ে। ছোট ছেলেকে প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করানোর পরিকল্পনা তার এবং বড় মেয়ে একজন ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখে। পরিবারে এখন শিল্পীর মতামতের গুরুত্ব বেড়ে গেছে। তিনি আজ সকলের কাছে অনুকরণীয়।

ভবিষ্যত প্রত্যাশার কথা বলতে গিয়ে শিল্পী বলেন, এই কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানটিকে আরও বড় করবেন। নেত্রকোনা শহরে এবং শহরের বাইরে বড় একটি শো-রুম করার পরিকল্পনা আছে তার। নারীরা যেন স্বাচ্ছন্দে কাজ করতে পারে সেইভাবে গড়ে তোলা হবে তার প্রতিষ্ঠান। তার সামাজিক প্রত্যাশা ব্যাপক, যে সকল পরিবারের বৃদ্ধ পিতা মাতা তার পরিবারের দ্বারা অবহেলিত হচ্ছেন তাদের জন্য একটি বৃদ্ধাশ্রম গড়ে তুলবেন বলে নিজের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন তিনি। এছাড়াও প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি আবাসিক স্কুল গড়ার পরিকল্পনা রয়েছে শিল্পীর।

তথ্য সংগ্রহ ও রচনা: সানিয়াত রহমান।

আত্মপ্রত্যয়ী মর্জিনা এখন নারী অগ্রগমনের উদাহরণ

সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার আগরগাড়ী ইউনিয়নের সুলতানপুর গ্রামের মর্জিনা খাতুন শৈশব থেকেই একটু চঞ্চল প্রকৃতির। ১৯৯০ সালে জন্ম নেয়া মর্জিনার জীবনে একদিন ঘোর অন্ধকার নেমে আসে অকস্মাৎ তার বাবা মারা যাওয়ায়। চার বোনের মধ্যে তিনি তৃতীয়। বড় দুই বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট বোনকে নিয়ে মায়ের সাথে বসবাস তার।

বাবা মারা যাবার সময় তেমন কোন সম্পদ রেখে যেতে পারেননি। আর পারবেনই বা কী করে। পরের জমিতে বর্গাচাষ করে যে ফসল পাওয়া যেত তাই দিয়ে কোনোরকমে তাদের সংসার চলতো। সংসারের অভাবের কারনে তার বড় দুই বোনকে বাবা মা বেশীদুর লেখাপড়া করাতে পারেননি। কিন্তু ছোট বেলা থেকেই পড়াশোনার ব্যাপারে মর্জিনার বেশ আগ্রহ ছিল। পাড়ার ছেলেমেয়েরা যখন দল বেঁধে স্কুলে যেত তখন মর্জিনা উঠানে দাঁড়িয়ে তাদের পথের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। মর্জিনা তার মাকে অনুরোধ করেন তাকে স্কুলে পাঠানোর জন্য। কিন্তু অভাবের সংসার তাই মায়ের ইচ্ছা থাকলেও মর্জিনার ইচ্ছায় সায় দিতে পারেন না।

পরিবারের খাবার জোগাড় করার জন্য নিরুপায় হয়ে মর্জিনাকে অন্যের বাড়ীতে কাজ খোঁজার পরামর্শ দেন মমতাময়ী মা। মায়ের চিন্তা জুড়ে শুধু একটিই ভাবনা একটু বড় হলে একটা ভালো ছেলে দেখে মর্জিনাকে বিয়ে দিয়ে দিবেন। মর্জিনা পরের বাড়ীতে সারা দিন কাজ করেন আর রাতে স্থানীয় একটি ক্লাবের সহযোগীতায় রাতের স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি নিজের নাম লিখতে সমর্থ হলেন।

পড়াশোনার প্রতি মর্জিনার প্রবল আগ্রহ দেখে তিনি যে বাড়ীতে কাজ করতেন সেই বাড়ীর মালিক মোসলেম উদ্দিন তাকে একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে সুলতানপুর দাখিল মাদ্রাসায় ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন তিনি। ছবি আঁকা, সাইকেল চালানো, মাছ ধরা ইত্যাদি কাজে বেশ পটু হলেও সংসারের দায়িত্ব পালনেই সময় কাটে তার।

৮ম শ্রেণীতে পড়াকালীন সময়ে মর্জিনার জন্য তার মা এবং পাড়া-প্রতিবেশী বিয়ে ঠিক করে। বিয়েতে মত না থাকা সত্ত্বেও বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয় তাকে। পাশ্ববর্তী কদমতলা গ্রামের এনামুল হকের সাথে মর্জিনা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের পর মর্জিনার ধারণা ছিল গরীব, অসহায় বলে স্বামী তার প্রতি নির্দয় হবে এবং প্রতিনিয়ত খারাপ আচরণ করবে। কিন্তু না, যা ভেবেছিলেন মর্জিনা, তার স্বামী হল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। লেখাপড়ার প্রতি মর্জিনার আগ্রহ এনামুল হককে উৎসাহিত করে। মর্জিনার স্বামী স্থানীয় একটি হাই স্কুলের সামান্য বেতনের করনিকের চাকুরি করেন।

মর্জিনার বর দি হাঙ্গার প্রজেক্টের একজন উজ্জীবক। মর্জিনা তার বরের মুখে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশের আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলার উদ্যোগ এবং বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারেন। হাঙ্গার প্রজেক্টের নীতি, আদর্শ, কার্যক্রম তাকে অনুপ্রাণিত করে। উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য উৎসাহী হন তিনি। কারন তিনি তার স্বামীর মুখে শুনেছেন এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলে জীবনের মোড়ই পাল্টে যায়। জীবনে অনেক সফলতা আসে। ইতোমধ্যে মর্জিনা সাফল্যের সাথে দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ন হন। মর্জিনা একদিন জানতে পারলেন তার ইউনিয়নে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে। মর্জিনা উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহন করলেন নভেম্বর ২০০৮ এর ১৪৩০তম ব্যাচে । উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর জীবন সম্পর্কে তার অনেক ভ্রান্ত ধারনা পাল্টে যায়। নিজেকে অসহায় ভাবা, গরীব বলে নিজেকে গুটিয়ে রাখা, নিজের দরিদ্রাবস্থার জন্য ভাগ্যকে দোষ দেয়া, নিজের উন্নয়ন চিন্তায় বুদ হয়ে থাকা – এ বৃত্ত থেকে বেরুনোর প্রেরণা খুঁজে পেলেন তিনি উজ্জীবক প্রশিক্ষণ থেকে।

উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার ২ মাস পর মর্জিনা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর মাধ্যমে একটি সেলাইয়ের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর সেলাই এর কাজ করতে লাগলেন। পরিবারের সদস্যদের সেলাই কাজের পাশাপাশি অন্যবাড়ীর কিছু কিছু কাজ করতে লাগলেন এবং আয়ও করতে লাগলেন। পাশাপাশি গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের আত্মকর্মসংস্থানে উৎসাহিত করতে লাগলেন। ৪ মাস পর হাঙ্গার প্রজেক্ট এর মাধ্যমে গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের সহকারে ব্লক বাটিক এর উপর আরেকটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়া পরবর্তীতে কারচুপি ও বিউটি পার্লারের উপর আরো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এভাবে মর্জিনা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর সহযোগিতায় সাফল্যের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ হয়ে উঠেন।

এক বছরের মধ্যে মর্জিনা ২টি সেলাই মেশিন নিয়ে একটি মিনি গার্মেন্টস তৈরি করেন। যেখানে বিভিন্ন পোশাকের অর্ডার সরবরাহ করা হত এবং শাড়ীতে কারচুপির কাজসহ নানা ধরনের ডিজাইনের অর্ডার নেয়া হত। এই গার্মেন্টস থেকে মর্জিনা মাসে ৩ থেকে ৪ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করতেন। স্থানীয় উজ্জীবকদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তুললেন এবং সংগঠনের নাম রাখেন এনাম ফাউন্ডেশন। সংগঠনের মাধ্যমে মর্জিনা বিভিন্ন গরীব ছেলে মেয়েদেরকে কারচুপি, ব্লকবাটিক, সেলাই প্রশিক্ষণসহ নানা আত্ম কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। তার সংগঠনের মাধমে এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর অনুপ্রেরণায় আগরদাড়ি ইউনিয়নে এনাম ফাউন্ডেশন এবং মর্জিনা এখন অসহায় মানুষের বন্ধু। আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি এলাকার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন মর্জিনা।

নারীদের অধিকার রক্ষায় মর্জিনা দি হাঙ্গার প্রজেক্টের মাধ্যমে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের ফাউন্ডেশন কোর্স গ্রহণ করেন ২০০৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর, সিএসএস প্রশিক্ষণ সেন্টার, খুলনায়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মর্জিনা নারীর অধিকার, অবস্থা ও অবস্থান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন। বর্তমানে তার এনাম ফাউন্ডেশনে ৪০০ নারী কর্মরত আছেন। এভাবে মর্জিনা একের পর এক সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন। বাল্যবিবাহ সমাজে যাতে না হয় সে জন্যে গ্রামের মেয়েদের এবং মায়েদের সচেতন করেন তিনি। এছাড়া যৌতুক, নারী ও শিশু পাচার বিষয়ে বিভিন্ন সভা সেমিনার আয়োজন এবং নারী দিবস, রোকেয়া দিবস, কন্যাশিশু দিবস পালনেও ব্যাপক ভূমিকা রাখেন।

তথ্য সংগ্রহ ও রচনা: মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন।

দারিদ্র্যজয়ী রওশন এখন সফল উদ্যোক্তা

বাগেরহাট সদর উপজেলার ডেমা ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের হেদায়েতপুর গ্রামের এক সংগ্রামী নারী রওশন, পুরো নাম রওশন জাহান। মৌলভী তৈয়বুর রহমানের চার সন্তান। রওশন সবার ছোট। ছোটবেলা থেকেই রওশন সবার আদরে বড় হয়েছে। বাবা হেদায়েতপুর মাদ্রাসাতে শিক্ষকতা করতেন। রওশন যখন ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়েন, তখনই বাবা মারা যান। ফলে পরিবারে দুর্দশা নেমে আসে। সমাজের সহযোগিতায় লেখাপড়া চলছিল, কিন্তু এস.এস.সি. পরীক্ষার পূর্বেই ছোট ভাইয়ের সিদ্ধান্তে বিয়ের পিড়িতে বসতে হয় রওশনকে।

সংসারের হালচাল বুঝে ওঠার আগেই মাত্র সাতদিন পরই রওশন বুঝতে পারে তার স্বামী একজন নেশাগ্রস্থ । স্বামীকে নেশা আর অস্ত্রের দুনিয়া থেকে সরে আসতে বলে রওশন। কিন্তু স্ত্রীর আহ্বান শোনা তো দুরে থাক, উল্টো নির্যাতনের ঝড় নেমে আসে রওশনের ওপর। বাবার বাড়িতে এসে মাকে সব খুলে বলে রওশন। কিন্তু ভাইদের চাপে আবারও নেশাগ্রস্থ স্বামীর বাড়িতে যেতে বাধ্য হন নববধূ রওশন। কিছুদিন পর তিক্ততার সংসারে মা হতে চলে রওশন। ভেবেছিল বাবা হলে হয়ত স্বামী হয়তো পরিবর্তন হতেও পারে। কোলে সন্তান এলো কিন্তু স্বামীর পরিবর্তন এলো না। সহ্যের বাঁধ ভেঙ্গে ফের বাবার বাড়িতে ফিরে আসে রওশন। কিন্তু একজন নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কী দাম আছে এই সমাজ-সংসারে। সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয় তার। ফিরে যেতে বাধ্য হন সেই স্বামীর ঘরে। অত:পর একে একে তিন বাচ্চার মা হন রওশন। এখানেই শেষ নয়। এরই মধ্যে স্বামী আরও দুটি বিয়ে করেছে। রাগে- শোকে বাচ্চাদের ছেড়েই ফিরে আসে বাবার বাড়িতে। এবার রওশনের নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পালা। অন্যদের মতামতের ফল ভোগ করেছে অনেক। ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ সাল। রওশন তার স্বামীকে ডিভোর্স দেন। বাড়িতে ফিরে না যেয়ে বাগেরহাটের দশানিতে এক দুরসম্পর্কের আত্মীয় ঝর্নার বাড়িতে আশ্রয় নেন রওশন। কিন্তু চরম হতাশার মধ্যে ডুবতে থাকেন। মনে হয়- জীবনটা বৃথা হয়ে গেল- মরে যাওয়া উচিৎ ইত্যাদি।

২২ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮। রওশনের জীবনে আশার আলো নিয়ে ঐদিনের বিকেল। বিকেল ৪টায় বাগেরহাটের নারীদের একটি বৈঠক হয় দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উদ্যোগে। সে বৈঠকে উপস্থিত হন রওশন। সেখানের আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে পড়েন তিনি। আলোচনার মধ্যে আলোর সন্ধান পান রওশন। সভা শেষ হলে হাঙ্গার প্রজেক্টের প্রোগ্রাম অফিসার মাহবুব উল আলম বুলবুলের সাথে অনেকক্ষণ আলোচনার প্রেক্ষিতে তিনি নিজেকে খুঁজে পেতে শুরু করেন। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন নিজের জীবনটা নষ্ট করা যাবে না। বাবার বাড়িতে ফিরে যান এবং কি করা যায়- চিন্তা করতে থাকেন। এর মধ্যেই ঝর্নার কাছে খবর পান বাগেরহাট গণ বিদ্যালয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উদ্যোগে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ হবে। বাড়ি থেকে ২০ কিলোমিটার দুর হওয়া সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত নেন, যেভাবেই হোক প্রশিক্ষণে অংশ নিতে হবে। প্রথম দিন বাড়ি থেকেই প্রশিক্ষণে আসেন। বাকী দিনগুলো ঝর্নার বাড়িতে থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৩৫৪ তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণ শেষে রওশনের ভিতরে একটা কর্মস্পৃহা জেগে উঠে, খুঁজে পান বেঁচে থাকার মানে। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর তাগিদ আসে রওশনের জীবনে। শুরু হয় জীবনের এক নতুন অধ্যায়।

বাড়িতে মা আর রওশন। ভাইয়েরা ব্যবসা ও চাকরির কারণে বাইরে থকেন। রওশন ভাবে ভাইদের কাছে আর হাত পাতবে না, কারো বোঝা হবে না ভবিষ্যতে। এ চিন্তা থেকেই সে সেলাই, ব্লক-বাটিক ও কারচুপির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে নারী নেতৃত্ব বিকাশ শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করে নারীদের অধিকারসহ সব বিষয়ে তার ধারণা পাল্টে যায়। নারীরাও মানুষ, তারাও অনেক কিছু করতে পারে- এ ধারণা আরও পরিপক্ক হয়। শুরু হয় নতুন করে রওশনের পথ চলা।

আত্মকর্মসংস্থান:
বাড়িতে পড়ে থাকা সেলাই মেশিন মেরামত করে শুরু করেন দর্জির কাজ। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সহযোগিতায় খুলনায় একটি কাপড়ের দোকান থেকে বাকীতে কাপড় নিয়ে বাড়িতেই কাপড় বিক্রি আর সেলাইয়ের

কাজ শুরু করেন। মাসে দু'তিন হাজার টাকা আয় শুরু হয়। মাঝে মধ্যে হাঙ্গার প্রজেক্টের উদ্যোগে আয়োজিত সেলাই, ব্লক-বাটিক, কারচুপির ট্রেনিং-এ প্রশিক্ষক হিসেবেও কাজ শুরু করেন। এসব কাজের সাথে ২০১০ সালে তিনি নিজের বাড়িতেই একশ' মুরগী নিয়ে একটি খামার গড়ে তোলেন এবং সফলভাবে সেটি পারিচালনা করছেন এবং তা এখন একটি লাভজনক ব্যবসা হিসেবে দাড়িয়েছে।

সামাজিক উদ্যোগ:
রওশন এতদিনে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন। এবার তার সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণের পালা। নিজের এলাকার মানুষকে সচেতন করার জন্য তিনি সফলভাবে একটি উজ্জীবক প্রশিক্ষণও আয়োজন করেন। পরবর্তীতে এলাকার ৬০ জন নারীকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সহযোগিতার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। পাশাপাশি এলাকার ঝরে পড়া ছাত্র- ছাত্রীদের নিয়ে গড়ে তোলেন নিজের বাড়িতে একটি পাঠশালা। এখানে প্রথমে ১৯জন ছেলে-মেয়ে পড়ালেখা শুরু করে। পরবর্তীতে তাদের বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি হতে সহযোগিতা করেন।

সামাজিক এসব কাজকে এবার সাংগঠনিক রুপ দিতে চান রওশন। তাই, সতের জন নারীকে নিয়ে *'ছায়া নারী উন্নয়ন সমিতি'* নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। সংগঠনের সভাপ্রধান হিসেবে তিনি এবং সম্পাদক হিসেবে রাবেয়া খাতুনকে সাথে নিয়ে এখন এই সংগঠনটি পরিচালনা করছেন তিনি। সংগঠনের বর্তমান সঞ্চয় প্রায় দশ হাজার টাকা।
রওশন এখানে থেমে থাকেননি। এবার নিজের যোগ্যতা ও সামর্থ্য বাড়ানোর জন্য গত বছর নতুন করে পড়ালেখা শুরু করেছেন। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে প্রথম পর্বের পাঁচটি পরীক্ষায় ভালোভাবে উত্তীর্ন হয়েছেন। ২০১১ সালের এপ্রিল- মে মাসে ২য় পর্বের পরীক্ষার অপেক্ষায় আছেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে রওশন জানান, এলাকাকে বাল্যবিবাহ মুক্ত করা, সকল ছেলে মেয়েকে স্কুলে পাঠানো, পিছিয়ে পড়া নারীদের পুষ্টি-স্বাস্থ্যসহ সব বিষয়ে সচেতন করার মধ্য দিয়ে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন করতে চান তিনি।

তথ্য সংগ্রহ ও রচনা: এম,এ,বুলবুল।

সানজিদা আর পরাজিত প্রতিকূলতার গল্প

হতাশা আর হতাশা। কৈশোর, যৌবণ আর প্রৌঢ় সবই যেন হারিয়ে যাচ্ছিল হতাশায়। এভাবে তো কাটতে পারে না। তাই এমন একটা অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় কী– এটা নিয়ে খুব চিন্তিত সানজিদা। ২০০৮ সাল। নতুন একটা পথের সন্ধান পেল সানজিদা। জীবনে পরিবর্তন আসতে পারে এমন একটা আশা নিয়ে ১৩৩৪তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন সানজিদা । পরিবর্তনের সত্যিই একটা আলো দেখতে পেলেন প্রশিক্ষণটার মাঝে। প্রশিক্ষণটি তাকে নতুনভাবে বাঁচতে উদ্বুদ্ধ করে। নারী হয়েও পারিবারিক এবং সামাজিক প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা করে একটি উন্নত এবং দায়িত্বশীল জীবন গড়ে তোলা সম্ভব তা অনুধাবন করলেন। প্রমিক্ষণ গ্রহণের পর অন্যান্য নারীদের সাথে আলোচনা করলেন কি করা যায় তা নিয়ে। কয়েক দফা আলোচনা শেষে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যৌথ উদ্যোগে কিছু করার। ১৮ জন নারী একত্র হয়ে একটি সমবায় সমিতি গড়ে তুললেন। তারা সাপ্তাহিক ১০ টাকা হারে সঞ্চয় শুরু করলেন। বর্তমানে তাদের সঞ্চয় ৭,০০০ টাকা।

মাসিক সভায় তারা সঞ্চয়ের পাশাপাশি বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন ও স্যানিটেশনের মত সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন তাদের গ্রামে কোনো বাল্যবিবাহ হতে দিবেন না। গ্রামের মা এবং মেয়েদের সচেতন করতে লাগলেন বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে। সানজিদার উদ্যোগে ইতোমধ্যে ২টি বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে সক্ষম হন তারা। গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য, শিশু স্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে শাহপুর, সুলতানপুর, রাজকৃষ্ণপুর গ্রামে গ্রামে নিয়ে মহিলাদের নিয়ে বৈঠক করেন।

স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ীর লোকজন ধীরে ধীরে সানজিদার ব্যক্তিত্বের কাছে মাথা নোয়াতে শুরু করলেন। ২০০৯ সালে রাজকৃষ্ণপুর গ্রামে উজ্জীবকদের উদ্যোগে তৈরি হয় সামসাল বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সকলের অনুরোধে ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ২০০০ টাকা মাসিক বেতনে সহকারি শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি জেলে পল্লীর নারীদের নিয়ে বিভিন্ন সময় মা সমাবেশ এবং স্থানীয় সংগঠন করার উদ্যোগ নিলে স্থানীয় নারীরা সাড়া দেয়। ৪৭ জন নারী সাপ্তাহিক ১০ টাকা হারে সঞ্চয় জমার মাধ্যমে সম্প্রতি শুরু করেছে মহিলা সমিতি।

যে সানজিদাকে এতক্ষন এত সফল, দৃঢ় আর নেতৃত্বদানকারী একজন মানুষ বলে মনে হচ্ছে তার ফেলে আসা দিনগুলি কখনই এমন নয়। আজকের এ অবস্থানে আসতে তাকে অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হয়েছে।

সানজিদার জন্ম ১৯৭৬ সাল ব্রাহ্মণবাড়ীয়া'র নবীনগর এর আদালতপাড়ায়। ৮ সন্তানের মধ্যে ৬ষ্ঠ সন্তান তিনি। বাবা পরিবার পরিকল্পনা স্বাস্থ্য সহকারী হিসেবে কর্মরত। মা গৃহিনী। মধ্যবিত্ত পরিবারে সাংসারিক অভাব অনটনের মধ্যে থেকে সানজিদা জাহান বেড়ে ওঠেন। '৮৩ সালে নবীনগর পশ্চিমপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন নবীনগর পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে।

'৯২ সালে সদর উপজেলার মোখলেছুর রহমানের সাথে বিয়ে হয় । বিয়ের পর কিছুদিন শ্বশুরবাড়ী থাকার পর বাবার বাড়ীতে চলে আসেন পড়াশুনাটা চালিয়ে নেয়ার জন্য। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় '৯৩ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেন। এদিকে সানজিদা জাহানের কোল জুড়ে জন্ম নেয় একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তান। সন্তান জন্মের ২ মাস পর স্বামীর ইচ্ছায় সানজিদা শ্বশুরবাড়ীতে চলে আসেন।

শ্বশুরবাড়ী এসে সানজিদা পড়লেন মহা বিপদে। শ্বশুরবাড়ীর প্রথা অনুযায়ী পরিবারের সকল সদস্যর খাওয়া শেষ না হলে বাড়ীর বউ খেতে পারে না। সদ্য সন্তান জন্ম দেওয়া এই মানুষটি তাই প্রয়োজনীয় পুষ্টি, সহযোগিতা, যত্নআত্তি পাচ্ছিল না। বরঞ্চ শ্বশুরবাড়ীর লোকজনের সেবাশশুসায় মনোযোগী হতে হলো। এমনিভাবে চলতে চলতে অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে সানজিদা। সানজিদার বাবা এসে তাকে নিয়ে যেতে চাইলে শ্বশুরবাড়ীর লোকজন অনুমতি দেয়নি।

একসময় সানজিদা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। সানুজদার দাদীও খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। অবশেষে সানজিদার শাশুড়ী তাকে নবীনগর বাবার বাড়ীতে রেখে আসে। বাবা বাড়ীর যত্ন-আত্তিতে সানজিদা মোটামুটি সুস্থ হয়ে ওঠে। শ্বশুরবাড়ীর লোকজন সানজিদাকে নিতে আসে কিন্তু সানজিদা আর শ্বশুরবাড়ী যেতে রাজী হয় না। সে তার মেয়েকে নিয়ে বাবার বাড়ীতেই থেকে যায়।

শ্বশুরবাড়ীতে ফিরে না যাওয়ায় সানজিদার স্বামী মোখলেসুর রহমান তার স্ত্রী এবং মেয়ের কোন খবর রাখেননি। এইভাবে প্রায় ১ বছর অতিবাহিত হয়। যেহেতু স্বামী দীর্ঘদিন কোন প্রকার খোঁজ-খবর রাখেনি, সেই কারনে সানজিদার বাবা, মা সম্পকর্টা বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। মোখলেসুর রহমান এ সিদ্ধান্তে হতবাক হয়ে সানজিদার বাবা, মায়ের সাথে দেখা করে এবং ক্ষমা চেয়ে সানজিদাকে তার বাড়ী নিয়ে যায়।

মোখলেসুর রহমান তার জন্য একটি চাকুরীর ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য সানজিদার বাবাকে প্রতিনিয়ত চাপ দেয়। কিন্তু তার সরকারি চাকুরী করার বয়স শেষ হওয়ার কারনে সানজিদার বাবা চাকুরী জোগাড় করে দিতে ব্যর্থ হয়। এতে সানজিদার প্রতি জামাইর নির্যাতনের ধরণ পাল্টে যায়। ঘরের আসবাবপত্রের দাবিও জানায় শ্বশুরের কাছে। চলতে থাকে সানজিদার উপর মানসিক নির্যাতন। সানজিদাকে তার বাবারবাড়ীর সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করতে দেয়া হয়না। যোগাযোগ করলে নেমে আসত শারীরিক নির্যাতন। এভাবেই কেটে যায় ৫টি বছর।

'৯৮ সালে সানজিদার কোল জুড়ে আসে একটি ছেলে সন্তান। ছেলে জন্মের পর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন কিছুটা কমে আসে। ২০০০ সালে আবার একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন সানজিদা জাহান। যখন ছোট ছেলের বয়স ৮/৯ মাস তখন স্বামী মোখলেসুর রহমান দ্বিতীয় বারের মত স্ট্রোক করেন। শারীরিকভাবে অসুস্থ হওয়ার কারণে আগের মত কাজ-কর্ম কারতে না পারায় সানজিদা বেগম ঢাকায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে হাতের কাজে যোগ দেন। মাসিক আয় হয় ৩,০০০ টাকা থেকে ৩,৫০০ টাকা।

২০০৪ সালে মোখলেছুর রহমান নিজ গ্রাম সুলতানপুর গ্রামে ফিরে আসেন স্ত্রী ও ৩ সন্তানসহ। ঢাকা থেকে ফিরে আসার পর থাকার ঘর পর্যন্ত ছিল না তাদের। মেজো জায়ের ঘরে থাকতেন। এর জন্য জায়ের কথা শুনতে হতো। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য বাবার বাড়ীতে যেতে হতো।

সানজিদার ভগ্নিপতি শালিকার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মোখলেসুর রহমানকে ঢাকায় একটি কোম্পানীতে ৭৫০০ টাকা বেতনের চাকুরি দিয়ে দেন। মোখলেছুর রহমান ঢাকায় চলে আসেন। সানজিদার উপর আবার চলতে থাকে শ্বশুরবাড়ীর লোকের নির্যাতন।

স্বামী চাকুরি নিয়ে ঢাকায় চলে যাওয়ার কয়েক মাস পর ২০০৫ সালে সানজিদা স্থানীয় সানফ্লাওয়ার কিন্ডারগার্টেন নামে একটি প্রতিষ্ঠানে ৬০০ টাকা বেতনে চাকুরি নেন। এছাড়াও প্রাইভেট টিউশনী এবং সেলাইয়ের কাজ করতেন। মাসে সেলাই থেকে ৫০০ টাকা এবং প্রাইভেট টিউশনি থেকে ৪০০ টাকা আয় হতো তার। স্বামী তার চাকুরির সামান্য টাকা দিত, যা দিয়ে সংসার চালানো কষ্টকর হতো। সানজিদার আয়ে সংসার একটু ভালোভাবে চলতে লাগলো। কিন্তু মোখলেসুর রহমান বাধ সাধলেন সানজিদার চাকুরিতে। পারিবারিক প্রতিবন্ধকতার কারণে সানজিদা চাকুরি ছাড়তে বাধ্য হন। কিন্তু এভাবে তো চলতে পারে না। এমন কিছু একটা করতে হবে যাতে সংসারও রক্ষা হবে আবার নিজে আয়রোজগারও করতে পারবে। এরপর শুরু হয় প্রশিক্ষণ গ্রহনের মধ্য দিয়ে নিজেকে গড়ার কাজ। এরপরের ইতিহাসটা আমরা আমরা গল্পের শুরুতেই জানতে পাই।

উজ্জীবক সানজিদা এখন অনেক বলিষ্ঠ একজন মানুষ। তিনি তার ছেলেমেয়েদেরকে আত্মনির্ভরশীল মানসিকতাসম্পন্ন সুযোগ্য মানুষ বানাবেন, এটাই তার প্রত্যাশা।

তথ্য সংগ্রহ ও রচনা: আব্দুল হালীম।

জবা: নিজের পায়ে দাঁড়ানো এক সংগ্রামী নারী

জবা বেগম। জন্ম '৭৭ সালে গাইবান্ধা'র পশালবাড়ী উপজেলার পুনিয়াগাড়ী গ্রামে। ৫ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে জবা ৫ম। বাবা মোঃ ভোলা শেখ একজন কৃষিজীবি, মা বলী বেগম গৃহিনী। গ্রামে বাবার কিছু ধানী জমি ও ১টি দোকান থেকে যা আয় হতো, তাতে ৯জন লোকের ন্যূনতম খাওয়া-পরা চলে যেতো। দরিদ্র পরিবারে চার ভাইয়ের পর জবার জন্ম হয়, স্বাভাবিক কারণেই বোনের আদর ছিল বেশী। বাল্যকাল থেকেই জবা ছিলেন দুরন্ত প্রকৃতির। স্কুলে যেকোন অনুষ্ঠানে খেলাধুলায় তিনি অংশগ্রহণ করতেন। কোন জড়তা ছিল না। সবার সাথেই খোলামেলা কথাবার্তা বলতেন। মজার মজার গল্প শুনিয়ে সবাইকে মাতিয়ে রাখতেন। এক কথায়, সবার মধ্যমনি ছিলেন জবা। সংসারে অভাব ছিল কিন্তু ভালোবাসার কমতি ছিল না। যে যতটুকু পারতো ছোট বোনকে দিতো। এভাবেই জবার বেড়ে উঠা।

জবার শিক্ষা জীবন শুরু হয় ১৯৮২ সালে পিয়ারী পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। লেখাপড়ায় ভালই ছিলেন। এমনিতে তো মেয়ে তার ওপর দারিদ্র্য ছিল নিত্যদিনের সঙ্গী। ফলে ৫ম শ্রেণীতেই জবার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। ১৩/১৪ বছরে বয়সেই বাবা মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে থাকেন। এরমধ্যে অনেক পাত্র জবাকে পছন্দ করেছেন। কিন্তু দেনা-পাওনায় রফা না হওয়ায় বিয়ে হয়নি।

পলাশবাড়ী উপজেলার কিশোরগাড়ী ইউনিয়নের নয়নপুর গ্রামে ছেলে মোঃ আমিনুল ইসলাম লজিং থাকতেন জবাদের বাড়ীতে। আমিনুলের সাথেই জবার সখ্য গড়ে ওঠে। দু'জনে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু বিষয়টা জবার বাবা-ভাইয়েরা মেনে নিতে পারেনি। এজন্য জবাকে মারও খেতে হয়েছে অনেক। তারা আরও ভালো ছেলের সাথে বিয়ে দেবেন। অন্যত্র পাত্র খুঁজতে থাকেন বাবা-ভাইয়েরা। কিন্তু জবার মনোভাবের কারণে পারিবারিকভাবেই ১৯৮৭ সালে তাদের বিয়ে হয়। যেহেতু ছেলে বেকার, লেখাপড়া শেষ হয়নি, তাই জবা বিয়ের পর বাবার বাড়ীতেই থাকেন। আবার লেখাপড়া শুরু করেন। আমিনুল টিউশনি ছাড়া কিছুই করতো না। বিয়ের পর বাবার বাড়ীতে থাকা কতটা যন্ত্রণার- ভুক্তভোগীমাত্রই বুঝতে পারে। জবা বলেন, 'ভাইদের আদর-ভালোবাসা যেন রাতারাতি বদলে গেলো। যে ভাইদের আমি এতদিন চিনতাম তারা আজ সম্পূর্ণ অচেনা মানুষ। তারাও বিয়ে করেছেন। দু'বছর বাবার সংসারে থেকেছি-খেয়েছি। এজন্য অপমান- লাঞ্ছনা- গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে ঢের। তারপরও স্বামীর নিরুপায় অবস্থা বিবেচনা করে দু'বছর অতিকষ্টে বাবার সংসারে কাটিয়েছি।'

ততদিনে ভাইয়েরা তার পড়ার খরচ বন্ধ করে দিয়েছে। আলাদাভাবে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও করতে বলেছে। বেকার স্বামী, অসহায় জবা এ মুহূর্তে যাবে কোথায়? খাবে কী? দুশ্চিন্তায় দিশেহারা হয়ে পড়েন জবা। কিন্তু আত্মসম্মানবোধ তাকে পথ চলার তাগিদ দেয়। পিছনে ফিরে তাকানো না, অন্যের সংসারে আর খাওয়া নয়। বাবার বাড়ির এক কোনায় টিনের চালা ও চারিদিকে পাটকাঠীর বেড়া দিয়ে একটি ঘর তোলেন জবা। সেখানেই সংসার শুরু করেন জবা। স্বামীর টিউশনির উপার্জন দিয়েই জীবনযুদ্ধ শুরু তার। অতিকষ্টে খেয়ে- না খেয়ে দিনাতিপাত করতে থাকেন। এমন সময়ে প্রতিবেশি এক ভাবীর পরামর্শে বেসরকারি সংস্থা *আশা* সমিতির সদস্য হন। সমিতি থেকে ২০০০ টাকা ঋণ নেন এবং নিজের পোষা ছাগলটি ৭০০ টাকায় বিক্রি করেন। এই টাকা দিয়ে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে মুদির দোকান চালু করেন। টিউশনির টাকা ও দোকানের আয় দিয়েই একভাবে জীবনের চাকা সচল হলো জবার। আগের ঋণ শোধ করে আবার ৩০০০ টাকা ঋণ নেন। ২০০০ টাকায় একটি গাভী এবং ১০০০ দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করেন। এর মধ্য দিয়ে জবা এক উপার্জনক্ষম নারীতে পরিণত হতে থাকেন। কিন্তু এখানেই পথ চলার শেষ নয়।

ঘরে-বাইরে কাজ করার সুবাদে জবার সাথে অনেকের পরিচয় ঘটে। এভাবে ১৯৯০ সালে আনসার ভিডিপির ইউনিয়ন দলনেত্রী জাহানারা বেগমের সাথে তার পরিচয় হয়। তিনি জবাকে আনসার ভিডিপি'র গাইবান্ধা অফিসে নিয়ে যান এবং হাঁস-মুরগী পালনের ওপর ১৪ দিনের একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করান। কিন্তু পরিবারের লোকজন তাতে নারাজ হয়। শুধু তা-ই নয়, নোংরা কথাবার্তাও বলে। কিন্তু জবা তাতে কর্ণপাত করেনি।

প্রশিক্ষণ থেকে ফিরেই তিনি হাঁস-মুরগী পালন শুরু করেন। এবার শুধু বাড়ীতে নয়, এলাকার নারীদের সাথে চলে তার আলোচনা। কীভাবে নারীরা আয় করতে পারে, নিজেদের সম্মান-মর্যাদা বাড়াবে কীভাবে ইত্যাদি।

আনসার সদস্য জাহানারা বেগমের সহযোগিতায় তিনি গ্রাম সরকারের সদস্য নির্বাচিত হন। এখানেই থেমে থাকার মানুষ নন জবা। নুনিয়াগাড়ী এলাকার মহিলাদের সংগঠিত করে ২০০১ সালে 'উত্তরা নারী উন্নয়ন সংগঠন' গড়ে তোলেন; যার সদস্য সংখ্যা ৩০ জন। এই সংগঠনের সঞ্চয় এখন প্রায় ৩০,০০০ টাকা। সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে সচেতনতামূলক কার্যক্রমে যুক্ত করেছেন তিনি।

এমন এক পর্যায়ে এসে নিজ গ্রামের বাসিন্দা মোঃ মান্নাফ সরকার ও স্ত্রী মাহমুদা বেগমের কাছে জানতে পেরে জবা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ-এর ১৩৫১তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

উজ্জীবক প্রশিক্ষণে নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত আলোচনা তাকে নতুন করে নাড়া দেয়। নিজের জীবনের অনেক বঞ্চনা আর সামাজিক জীবনে নারী হিসেবে তিনি কোথায় আছেন তা দেখতে পান এই নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক আলোচনার মধ্যে। শুরু হয় নতুন ভাবনা। নিজের জীবনে এতদিন যা ঘটেছে তা যেন আর অন্য নারীর জীবনে না ঘটে-এমন কী করা যায় তা নিয়ে ভাবতে শুরু করেন জবা। এছাড়া, প্রশিক্ষণে আলোচিত ১০টি নীতি, স্বপ্নের আদর্শ গ্রাম, জ্ঞানের রাজ্য বিষয়ক আলোচনা তাকে নতুন করে ভাবতে শেখায়। এরপর গত ৫ থেকে ৭ আগস্ট ২০১০ তারিখ-এই তিনদিন তিলোত্তমা রংপুরে ৫৭ তম ব্যাচে নারী নেতৃত্ব বিকাশ ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

এসব প্রশিক্ষণ জবাকে সামাজিক কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। আত্মকর্মসংস্থানের লড়ায়ের পাশাপাশি এবার তিনি বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, যৌতুকের বিরুদ্ধে আন্দোলন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি কার্যক্রমসহ বৃক্ষ রোপন ইত্যাদি বিষয়ের ওপর নিয়মিত উঠান বৈঠক, আলোচনা সভা ও ক্যাম্পেইন শুরু করেন। জবার উৎসাহের মধ্য দিয়ে একই গ্রামের জহুরা বেগম সেলাইয়ের কাজ করে সংসার চালাচ্ছেন।

জবার কাজের পরিধি এখন অনেক বেড়েছে। নুনিয়াগাড়ী ছাড়াও পলাশবাড়ী উপজেলার হোসেনপুর, কিশোরগাড়ীসহ আরও কয়েকটি ইউনিয়নে তার নেতৃত্বে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তিনি নিজে এখন প্রশিক্ষকের দায়িত্বও পালন করেন। বেকার ছেলে-মেয়েদের সেলাই, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, ব্লক-বাটিক ইত্যাদি বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহযোগিতা করছেন।

প্রচেষ্টা আর আত্মবিশ্বাস যে মানুষকে বদলে দিতে পারে, জবা তার অন্যতম উদাহরণ। অন্যের ওপর নির্ভরতা কাটিয়ে তিনি আজ স্বনিভর এক নারী। বর্তমানে তার মাসিক আয় প্রায় ১৫,০০০/- টাকা। স্বামী এখন ঢাকায় চাকরি করছেন। তার সেই টিনের চালা ঘরটি এখন আর নেই, সেখানে গড়ে তুলেছেন তিন কক্ষের পাকা বাড়ি।

জবা শুধু নিজের উন্নয়নে নিয়ে ব্যস্ত থাকেননি। পাশাপাশি অন্যদের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করেছেন সমান তালে। তার সহযোগিতায় অনেক নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। জবা নিজের মতো সমাজের অন্য নারীদের জীবনে আনতে চান পরিবর্তন। এ লক্ষ্যেই তিনি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

তথ্য সংগ্রহ ও রচনা: শামীমা রহমান।

জাগরন্নেছার জাগরণী উদ্যোগ

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার বড়কান্দা গ্রামের আত্মপ্রত্যয়ী এক নারীর নাম জাগরন্নেছা। ডাকনাম নিপা। জন্ম ১৯৭৮ সালে। বাবা ছিলেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। পরিবারটা বেশ বড়, ৬ ভাই ও ৪বোন।

১৯৯৫ সাল। জাগরন্নেছা নিপা গুজাদিয়া আব্দুল হেকিম উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষা দেয়। তার বিয়েটাও হয় এ সময়ে। ফলে তার লেখাপড়া আর অগ্রসর হতে পারে না। বিয়ে হয় ভাটি এলাকায়। স্বামীর নাম সাইফুল ইসলাম। উজান এলাকার মেয়ে ভাটি অঞ্চলে এসে বেমানান হয়ে যায়। স্বামী চাকুরি করে কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর থানার একটি ফাজিল মাদ্রাসায়। দুর অঞ্চলে স্বামীর অবস্থান হওয়ায় নিপা সবসময় একটা শূন্যতা অনুভব করতো। পশ্চাৎপদ ভাটি অঞ্চল ও স্বামীর দুরে থাকা এ দু'টি বিষয়ে নিপা হতাশ হয়ে বাপের বাড়ীতে থাকা শুরু করে। স্বামীর বাড়ীতে থাকতে তার দু' ছেলের জন্ম । ২০০৩ সালে বাপের বাড়ীতে বেড়াতে এসে ১৭দিনের মাথায় নিপা জানতে পারে স্বামী আরেকটি বিয়ে করেছে। এ খবরের পর সে আর স্বামীর বাড়ীতে ফিরে যায়নি। দুই ছেলেকে মানুষ করার স্বপ্ন নিয়ে নিপা সামনে এগিয়ে যায়। নিপার ভাষায় "আমি আর স্বামীর বাড়ীতে ফিরে যেতে চাই না- চাই দু'টি সন্তানকে মানুষ করতে আর এলাকার উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করতে। নিপা আরো জানায় যে, যেহেতু আমরা পুর্ব থেকে অসচ্ছল নই, তাই অস্বচ্ছল মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ আমার আছে। আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে তাদের অসচ্ছলতা দুর করতে চাই।"

এলাকার উন্নয়নের জন্য নিজের আগ্রহ বিষয়ে তিনি জানায় "আমি ২০০৬ সালের গুজাদিয়া আব্দুল হেকিম উচ্চ বিদ্যালয়ে যে উজ্জীবক প্রশিক্ষন হয় সেখানে আমি অংশগ্রহন করেছি, সেখান থেকেই আমার প্রেরণা লাভ। আমি এ প্রশিক্ষণের ১০০৮তম ব্যাচের উজ্জীবক। তাছাড়া আগে থেকেই আমি নিজে টুকটাক সেলাই করতাম। কয়েক বছর দক্ষতার সাথে পোশাক তৈরী করে অর্থ আর সুনাম দুটোই অর্জন করেছি, ২০০৭ সালে ব্লক বাটিকের কাজ শিখেছি। তাছাড়া শাড়ি কাপড়ে নকশা করায় আমার হাত আছে। "

২০০৭ সালে তিনি বড়কান্দা গ্রামের উজ্জীবক নুরুন্নাহার রানীর বাড়ীতে হাঙ্গার প্রজেক্টের মাধ্যমে ব্লক বাটিকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এতে ২৮জন নারী অংশ নেন। বেশ ক'জন এ যাবত দক্ষতার সাথে ব্লক বাটিকের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

২০০৮ সালে রাণীর বাড়ীতে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট কর্তৃক সেলাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এতে ৩০জন নারী অংশ নেন। এসব দক্ষতামুলক কাজের ফলে অনেকে আজ তাদের জীবনকে পাল্টে দিয়েছে। ২০১০ সালে নিপা তার ভাই শফিকুল ইসলাম বাবুলের মাধ্যমে শাড়ি কাপড়ে নকশা করার জন্য ঢাকা থেকে দেলোয়ার হোসেন নামের একজন ট্রেইনারকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসেন। শাড়িতে নকশা করার কাজ শেখার পর এ কাজের অর্ডার পায় নিপা। নিপা প্রশিক্ষণ

গ্রহণকারীদের মাঝে ভাল করে তা বুঝিয়ে দেন। কাজ শেষে এতে অংশগ্রহণকারীগণ প্রত্যেকেই ৮০০ টাকা করে পারিশ্রমিক পান। এভাবেই প্রতিনিয়ত নিপা সমাজের উন্নয়নে নতুন কর্মের দিশা দেখিয়ে যাচ্ছেন এলাকাবাসীকে।

সমাজের উন্নয়নের জন্য আর কী কী কাজ করছেন-এমন প্রশ্নের উত্তরে নিপা বলেন, "আমার গ্রামের অন্যান্য উজ্জীবকদের নিয়ে ৭শত পরিবারের মধ্যে ৫শত পরিবার আজ স্যানিটেশনের আওতায় এনেছি। আশা করি অল্প দিনের মধ্যেই তা শতভাগ করবো।"

বর-কনে উভয়পক্ষের লোকজনকে বুঝিয়ে ৫/৬টি যৌতুকবিহীন বিয়ের ব্যবস্থা করেছি- তন্মধ্যে প্রতিবেশী শারমিন আক্তারের বিয়েটি বেশ আলোচিত। তার স্বামী বিল্লাল মিয়াও আনন্দের সাথে যৌতুকবিহীন এ বিয়ে মেনে নেয়। যৌতুকবিহীন বিয়ের চর্চা গ্রামে এখন নিয়মিত চলছে।

গত বছর প্রতিবেশীর ৮ম শ্রেণী পড়ুয়া মেয়ে তাহমিনা খাতুনকে তার বাবা মা বিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু নিপা তাদেরকে বিষয়গুলো বুঝিয়ে অর্থাৎ অল্প বয়সে বিয়ের কুফল ও পরিনাম বর্ণনা করে এ বিয়ে বন্ধ করে।

তাছাড়া আর্তপীড়িতের কান্না নিপাকে ব্যথিত করে । প্রতিবেশী জুনা আক্তার(৩৫) একবার প্রচন্ড পেটের ব্যথায় ছটফট করতে থাকে। ওরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল। চিকিৎসার অর্থ তো দুরের কথা ডাক্তারখানায় যাবার খরচটুকুও তাদের নেই। এ অবস্থায় নিপা রিক্সা ভাড়া করার জন্য টাকা প্রদান করে। রোগীকে প্রথমে করিমগঞ্জ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, পরে কিশোরগঞ্জ সদর হাসপাতালে প্রেরণ করে। ৫/৬ দিনের মাথায় জুনা আক্তার সুস্থ হয়ে ফিরে আসে। এতে এলাকাবাসী আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়। অসুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এলাকাবাসী নিপার কাছে ছুটে আসে, নিপা সাধ্যমত তাদের সহযোগিতা করার চেষ্টা করে।

অবাধে গাছ কেটে ফেলার কারনে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে । জ্বালানী, ঘরের আসবাবের জন্য যে পরিমান গাছ কাটা হচ্ছে সে পরিমানে বৃক্ষ রোপন করা হচ্ছে না। তাই এ অবস্থা উত্তরণের জন্য উজ্জীবকদের বন্ধু করিমগঞ্জের সাদেক আহমেদ স্বপনের সহায়তায় এলাকার নূরুন্নাহার রাণী, কাসেম ও রকি সহ সবাইকে নিয়ে বড়কান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষের চারা রোপন কওে নিপা । এতে এলাকাবাসী উৎসাহিত হয় এবং তা অনুসরণ করে স্বউদ্যোগে বৃক্ষরোপনের একটা রেওয়াজ চালু করে। এতে পাল্টে যায় গ্রামের প্রাকৃতিক চিত্র।

কন্যা শিশুর অধিকার নিয়ে সে ২০০৭ হতে এখন পর্যন্ত কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামের ব্যানারে নানা কর্মসূচি পালন করে আসছে। একই সাথে পালন করে আসছে নারী দিবসসহ অন্যান্য জাতীয় দিবসসমুহ।

নিপা মূলতঃ তার দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে অলস হাতকে সচল করার জন্য এলাকার লোকজনদের দক্ষতা বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। স্যানিটেশনের আওতায় এনেছে তার গ্রামকে। তবে এসব উন্নয়নমুলক কাজে জাগরন্নেছা নিপার চলার পথ কখনো কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, ছিল কণ্ঠকাকীর্ণ। অদম্য স্পৃহা আর পরিশ্রমে নিপা আজ এলাকার নারী জাগরণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তথ্য সংগ্রহ ও রচনা: রেজাউল হাবীব রেজা।

একটি সবুজ কাননের গল্পকথা

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আর দৃঢ় মানসিক শক্তিই পারে মানুষকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে। জীবন থেকে উপলব্ধ বাস্ত বতা এবং দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশের কর্মকৌশল অনুসরণ করে এই বাণীটিই উচ্চারণ করলেন নাজনীন আক্তার। জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বন্ধুর পথ অতিক্রম করে গন্তব্যে পৌঁছানোর মনোবলকে পুঁজি করতে পারলে সাফল্য আসে হাতের মুঠোয়। প্রতিটি সফলতার কাহিনীর পেছনে থাকে বৈরিতা, বাঁধা আর ব্যর্থতা জয়ের ইতিহাস। মানুষের প্রতিষ্ঠার এই ইতিহাস চিরন্তন। অসহ্য দারিদ্র্য আর ভাগ্যকে মেনে না নিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বলীয়ান এমন একজন মানুষ নাজনীন আক্তার।

শরীয়তপুর জেলার তুলাসার ইউনিয়নে ছোট্ট একটি গ্রাম স্বর্ণঘোষ। স্বচ্ছল গৃহস্থ আলেপ খানের বড় মেয়ে নাজনীন আক্তারের সংগ্রাম শুরু হয় অনেক ছোটবেলা থেকেই। নাজনীন যখন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী, তখন বাবা মারা যান। পিতার মৃত্যুতে দারুণ অনটনে পড়ে যায় সংসার। চাষ নির্ভর পরিবারে চাষ করার লোক নেই। সেই থেকে পরিবারের হাল ধরার জন্য জমির হাল হাতে তুলে নেন ১২ বছর বয়সী নাজনীন। পুরুষ শ্রমিকদের পাশাপাশি বাবার জমিতে তিনিও একজন শ্রমিক হয়ে যান। কিন্তু চাষবাসের এই নারী শ্রমিককে সমাজের কেউ সুনজরে নিতে পারেনি। এই প্রতিবন্ধকতা পাশ কাটিয়ে নাজনীন নিজের পথে গতিশীল হন। পিতার অবর্তমানে পিতার মতো দায় ও দায়িত্ব নিয়ে বড় হয়ে উঠতে থাকেন। ঐকান্তিক চেষ্টায় মাধ্যমিক পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হন। চোখে মুখে স্বপ্ন নিয়ে ভর্তি হন শরীয়তপুর কলেজে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই অপহরণকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হন তিনি। আশেপাশের মানুষের সহযোগিতায় সে যাত্রায় রক্ষা পেলেও কলেজে আর যাওয়া হয় না তাঁর। ঢাকার এক চিত্র ব্যবসায়ী নেহাজ মোহাম্মদ মন্টুর সাথে বিয়ে হয়ে তার। স্বচ্ছল সংসারে ভালোই কাটছিল দিন, বিয়ের চতুর্থ বছরে একটি পুত্র সন্তানের মা হলেন।

নব্বই সালের দিকে বাংলা সিনেমা যখন পড়তির দিকে মোড় নিচ্ছিল তখন স্বামী নেহাজ বড় ধরণের মার খেলেন ব্যবসায়। দেশের বাড়ি রাজবাড়ীতে অবস্থিত নিজেদের সিনেমা হলটিও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ঢাকা ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে সন্তানসহ এসে উঠলেন শ্বশুরালয়ে। চিত্র ব্যবসায় হেরে গিয়ে প্রায় সর্বস্ব খুইয়ে বসেন স্বামী। মায়ের কাছে হাত পেতে সে যাত্রায় রক্ষা পেতে চেয়েছিলেন নাজনীন, কিন্তু ঋণের বোঝা বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কোন লাভই হলোনা তাঁদের।

নাজনীন বুঝতে পারে, এখানে আর নয়। স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি ফিরে এলেন নিজের গ্রামে, মায়ের কাছে। যেখান থেকে তিনি জীবনের জন্য সংগ্রাম করতে শিখেছিলেন। পিতার অংশ থেকে পাওয়া জমিতে ছোট্ট একটি ঘর তুলে স্বর্ণঘোষ গ্রামে শুরু হয় তাঁর সংগ্রামের নতুন জীবন।

মাত্র ৫০০০ টাকা ঋণ নিয়ে একটি মুরগীর খামার গড়ে তোলেন বাড়িতে। দুজন মিলেই চলছিল এই খামার তৈরির কাজ। চলছিলো ভালোই। এরমধ্যে মাস্টাররোলে একটি চাকুরিও জোটে বিদ্যুৎ অফিসে। এইভাবে ধীরে ধীরে গ্রামের মানুষের সঙ্গে মেশার সুযোগ আবার তৈরি হয়। শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান নাজনীন সহজে সবার মন জয় করেন। গ্রামের মানুষ বিপদে আপদে তার কাছে ছুটে আসে, পরামর্শ গ্রহণ করে। সবচেয়ে বেশি আসে নারীরা।

এই নারীদের সুখ দুখের কথা শোনেন, পরামর্শ দেন, তাদের সুখ দুখের সাথী হন। তিনি দেখতে পান তাঁরই মতো আর দশজন হতভাগ্য নারীর জীবন, পার্থক্য শুধু একটাই- তিনি বারবার সংগ্রাম করছেন, কিন্তু গ্রামীণ নারীরা সে মানসিক শক্তি না থাকার কারনে থমকে গেছে। তিনি সবাইকে নিয়ে একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান চালু করলেন। প্রতিষ্ঠানের নাম দেয়া হল "স্বর্ণঘোষ মহিলা উন্নয়ন সমিতি"। কিন্তু, এই সমিতি বেশিদুর এগিয়ে যেতে পারলো না। একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে এই সংগঠনের সভাপতি করা হয়েছিল। অসহায় নারীদের জমানো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের উপর লোভ দমন করতে পারেননি তিনি। যার ফলে দেখা দেয় সংকট, হিসাবে গরমিল। নাজনীনদের সরলতার সুযোগে এই প্রতিষ্ঠানটি তার

সত্তা হারায়। সমাজসেবা যে কত ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার তা হাড়ে হাড়ে টের পান নাজনীন। মানুষের জন্য কাজ করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন তিনি।

কিন্তু, সমাজসেবা যার নেশা, সে কি আর ঘরের মধ্যে বন্দি থাকতে পারে? কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরির চেষ্টা করেন, আলোচনায় অংশ নেন। বিপদে আপদে ছুটে যান। যেচে গিয়ে পরের উপকার করেন। গ্রামের মানুষ অসুখ হলে ঝাড়ফুঁক বেশি পছন্দ করে, তিনি তাদের হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করান। সন্তান-সম্ভবা মায়ের ও নবজাতক শিশুর যত্ন কীভাবে নিতে হবে- তা শেখান। লিভারের সমস্যায় গোবরগোলা না খাইয়ে যথার্থ চিকিৎসা নিতে শেখান। নতুন পরিবেশের এই মানুষগুলো প্রথমে তাঁর কথা শুনতে চাইত না, উৎপাত মনে করতো, বিরক্ত হত। স্বামী নেহাজ স্ত্রীকে বোঝান- অনেক হয়েছে সমাজসেবা, এখন সংসারের দিকে মনোযোগী হওয়া দরকার।

কিন্তু ২০০৬ সালে ডামুড্যায় অনুষ্ঠেয় উজ্জীবক প্রশিক্ষণ তাঁর মর্মমূলে আবার উদ্দীপ্ত করে জাগরণের প্রেষণা। দুর্বার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তিনি পরিচিত হন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ এর এক কর্মীর সাথে। তাঁর মাধ্যমে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারেন এবং উৎসাহিত হয়ে উজ্জীবক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। আত্মশক্তি, সামাজিক দায়বদ্ধতা তাঁকে আলোড়িত করে নতুনভাবে। তিনি বুঝতে পারেন, বসে থাকার সময় এখন নয়। মানুষের জন্য কিছু একটা করার সুযোগ যেন তাঁকে তৈরি করে দিয়েছে এই প্রশিক্ষণ। তিনি নিজেকে প্রতিশ্রুতিশীল করে তুলতে প্রয়াসী হন। এতদিন তিনি যেসব অবহেলিত নারীদের পাশে থেকে কাজ করেছেন ছায়ানীড়ের মতো, এই নারীরা তার সহযোদ্ধা হয়ে একই কাতারে সামিল হয়। এবার নাজনীন তাদের নিয়ে নতুন একটি প্রতিষ্ঠান চালু করেন "সবুজকানন নারী কল্যাণ সংস্থা"- নামে। এই সংস্থার সদস্যদের তিনি সেলাই প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। যাদের পুকুর আছে তারা মৎস্যচাষ, যাদের কিছু জমি আছে- তারা বৃক্ষরোপণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এখান থেকে। পরবর্তীতে এই সংগঠন কৃষকদের কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণও দেয়া শুরু করে। মূলত: প্রশিক্ষণকেন্দ্রিক কর্মকান্ড দিয়ে শুরু হয় এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম।

নিজেদের আয় থেকে সামান্য পুঁজি সঞ্চয় করে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে নারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন তিনি। ফলে দ্রুত জনপ্রিয়তা পায় তাঁর সংগঠন। এইভাবে মাত্র তিন মাসের নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে গ্রামের পঞ্চাশজন নারীকে সেলাই ও ক্রাফটের কাজে প্রশিক্ষিত করে তুলতে সক্ষম হন। নারীরা স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে পরিবারের আর্থিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে শুরু করে। তারা শিক্ষা চিকিৎসা ও জীবনবোধের সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ হয়। ঘূর্ণিঝড়, বন্যায় সবুজকানন নারী কল্যাণ সংস্থা'র কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কিন্তু তা একেবারে বন্ধ হয়ে যায় না। নাজনীন বেগম প্রশিক্ষিত, আত্মশক্তিতে বলীয়ান। সংগ্রাম করেছেন নিজের জীবনের সাথে, এখন তিনি জানেন-শুধু নিজের জন্যে নয়, সমাজের জন্যেও তাঁকে কাজ করে যেতে হবে। নাজনীন বেগম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নত জীবনের মন্ত্রে উজ্জীবিত হবার কথা বলেন, এ ক্ষেত্রে তার বিশ্বাস 'ভেতরের শক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে না পারলে কখনও নিজের উন্নতি সম্ভব নয়'। চেতনাকে আরও শানিত, বস্তুনিষ্ঠ করার জন্য তিনি 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক'- এর সদস্য হয়েছেন, স্থানীয় নারী নেটওয়ার্কের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁর কার্যক্রম এখন আরও গতিশীল। বৃদ্ধ নারী ও বিধবাদের জন্য আগামীতে আরও গঠণমূলক কার্যক্রম হাতে নিতে যাচ্ছেন তাঁরা। তাই সবুজকানন নারীকল্যাণ সংস্থা একটি সবুজ কানন রচনা করতে চায়। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা নিয়ে এটি বাস্তবায়ন করতে চান ।

তথ্য সংগ্রহ ও রচনা: হামিদুল হক।

সানোয়ারা বেগম: সমাজকর্মী থেকে কাউন্সিলর

আবু জিসান এম. আলমগীর

আড্ডা দেয়ার মতো সময় নেই তার। দারুন সংসারী মুন্সিগঞ্জের নগরকসবার মেয়ে সানোয়ারা। বাবা, মাও তার কাজ কর্মে সন্তুষ্ট। মেয়ে চার দেয়ালের মাঝে আবদ্ধ থাকে বলে এ নিয়ে তারা বেশ গর্ব করে বেড়াতেন। অথচ আজ সেই সানোয়ারা বেগমই মিরকাদিম পৌরসভার কাউন্সিলার এবং একজন সফল সমাজকর্মী। এর জন্য অনেক মুল্যও দিতে হয়েছে তাকে। দৃড় মনোবল, কোন কাজে নিবিষ্ট থাকার মানসিকতা তাকে এ সফলতা এনে দিয়েছে।

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার মীরকাদিম পৌরসভার নগর কসবা গ্রামে ১৯৭৩ সালে সানোয়ারা জন্মগ্রহণ করেন। ৬ বোন ১ ভাইয়ের মধ্যে সানোয়ারা সবার বড়। রিকাবি বাজার উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তিনি এসএসসি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ এবং সরকারি হরগঙ্গা কলেজ থেকে এইচএসসিতে দ্বিতীয় বিভাগ পাশ করেন। অতঃপর '৯০ সালের আগস্ট মাসে সানোয়ারা একই গ্রামের বেকার ছেলে শাহাবুদ্দিন (কালাচাঁন) কে বিয়ে করেন। কিন্তু তার এ সিদ্ধান্ত বাবা, মা মেনে নেয়নি। ফলে বিয়ের পরেই পরিবারের সাথে তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর ফলে তিনি অর্থনৈতিকভাবে দুরাবস্থায় পড়েন। এ সময় তিনি স্কুলের ছেলে মেয়েদের প্রাইভেট পড়ানো শুরু করেন। অবশেষে ২০০৪ সাল থেকে তিনি মীরকাদিম পৌরসভার কাঠপট্টিতে শহীদ জিয়াউর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। স্কুলে চাকুরির পাশাপাশি ২০০৫ সালে ন্যাশনাল লাইফ ইনসুরেন্স কোম্পানীতে কাজ শুরু করেন। এ সব কাজে তার বর কালচাঁন তাকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করতেন। ফলে তিনি পর্যায়ক্রমে দুরাবস্থা কেটে উঠতে থাকেন।

এ সময় রিকাবিবাজার ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও রিকাবিবাজার গার্লস স্কুলের সদস্য রিণু বেগমের সান্নিধ্যে আসেন। রিণু বেগম সানোয়ারকে ব্যাপকভাবে সামাজিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে থাকেন। এর পর থেকে ইউনিয়নের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং সমাজের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে যাতায়াত শুরু করেন। ২০০৪ সালের মীরকাদিম পৌরসভা নির্বাচনে তিনি ৩৮০০ ভোট পেয়ে কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ২০০৯ সালে ৩১ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি পঞ্চসার ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ১৪৫৫ তম উজ্জীবক প্রশিক্ষণে সানোয়ারা অংশগ্রহণ করেন এবং চতুর্থ ব্যাচে নারী নেতৃত্বের বিকাশ শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করে। উজ্জীবক এবং নারী নেত্রী হওয়ার পর থেকেই মুলত সানোয়ারা দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে সামাজিক কার্যক্রম শুরু করেন।

প্রশিক্ষণ দুটো'র মাধ্যমে তিনি বুঝতে পারেন যে, একজন মানুষ হিসেবেও সমাজের মানুষের প্রতি তার দায়বোধ রয়েছে। মানুষকে সংগঠিত করতে না পারলে সমাজের অধিকাংশ সমস্যারই সমাধান করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে সমাজের নারীদেরকে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য কাজ করতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

উজ্জীবক এবং নারী নেতৃত্বের বিকাশ শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্স করার পর সানোয়ারা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এলাকার মানুষের সাথে বসেন। বিশেষ করে যৌতুক, বাল্য বিবাহ, নিরাপদ পানি এ সব বিষয়ে মানুষকে সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন। এ সব কাজে তিনি মীরকাদিম পৌরসভার অন্যান্য কাউন্সিলারদেরকেও সম্পৃক্ত করেন ।

২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে সানোয়ারা নগর কসবা গ্রামের শাহজাহান মিয়ার মেয়ে তাসলিমাকে বাল্য বিবাহের হাত থেকে উদ্ধার করেন। মেয়ের বাবা কাজীকে বাসায় ডেকে ১৪ বছরের মেয়ে তাসলিমাকে ১৫ বছরের ছেলের কাছে বিয়ে দিতে চাইলে সানোয়ারা মেয়ের বাবাকে এ কাজ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানান। তাতে মেয়ের বাবা মৌখিকভাবে রাজী হলেও এক মাস পরেই গোপনে কাজী ডেকে রাতে মেয়ের বিয়ে দেয়ার আয়োজন করেন। খবর পেয়ে সানোয়ারা এলাকার গণ্যমান্যদেরকে সাথে নিয়ে মেয়ের বাবার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হন এবং সবাই মিলে মেয়ের বাবাকে বুঝিয়ে এ বিবাহ বন্ধ করান। সানোয়ারা ৪, ৫ এবং ৬ নং ওয়ার্ডে যৌতুক ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করার

জন্য মানুষকে সংগঠিত করতে থাকেন। ২০০৯ সাল থেকে ২০১০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি ৩ টি ওয়ার্ডে ৫০ টি উঠান বৈঠক করেছেন। তার নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ৩ টি ওয়ার্ডে বাল্য বিবাহের হার ১০ ভাগে নেমে এসেছে।

২০০৯ সালে তিনি নগর কসবার নারীদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করেন। অত:পর ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে তিনি **'নগর কসবা মহিলা সমিতি'** নামে একটি নারী সংগঠন গড়ে তোলেন্। প্রাথমিক পর্যায়ে ৩০ জন নারীকে সম্পৃক্ত করে তিনি এ সংগঠনের কার্যক্রম শুরু করেন। প্রতি মাসে ২০ টাকা করে মাসিক চাদা ধায্য করেন। গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস, মুরগী পালন, সবজির ব্যবসা, সেলাই প্রভৃতি কাজে তিনি সমিতির সদস্যদেরকে সম্পৃক্ত করেন। এ সব সদস্যদেরকে সমিতি থেকে ১০.০০০ টাকা করে ঋণ দিতেন। প্রতি মাসে ৮৪০ টাকা করে কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করা হয়। এ ছাড়া গরিব মেয়েদের বিয়ে দেযার ক্ষেত্রে **'নগর কসবা মহিলা সমিতি'** র ফান্ড থেকে সহযোগিতার ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। বর্তমানে মীরকাদিম পৌরসভার নগর কসবা গ্রামের রাশিদা বেগম, খাদিজা আক্তার, রেহানা আক্তার সানোয়ারার উদ্যোগে সেলাইয়ের কাজ শেখে নিজেদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করছেন। সানোয়ারা সমিতির সদস্যদেরকে নকশি কাঁথা তৈরী করা এবং কাগজের ঠোঙ্গা বানানোর কাজেও সম্পৃক্ত করেন। এ ছাড়া তিনি এলাকার নারীদেরকে সংগঠিত করে ক্ষুদ্র পরিসরে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলেন। সেসব সংগঠনগুলো ২০১১ সালের মধ্যে নাম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে বলে তিনি আশাবাদী।

সানোয়ারা ২০০৯ সাল থেকে ২০১০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মীরকাদিম পৌরসভার নগর কসবা, রিকাবি বাজার, কাগুজিপাড়া, দেওভোগ ও বিনোদপুরে 'জন্ম নিবন্ধন' বিষয়ে ২৫টি উঠান বৈঠক করেন। তার উদ্যোগে এ পর্যন্ত ১০০০ এর বেশী শিশুর জন্ম নিবন্ধন করানো হয়। ২০১২ সালের মধ্যে তিনি মীরকাদিম পৌরসভায় ১০০% জন্ম নিবন্ধন করার পরিকল্পনা করেছেন।

উজ্জীবক প্রশিক্ষণ নেয়ার পর সানোয়ারা ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডে ৫০ টি পরিবারের মধ্যে স্যানিটারি পায়খানার উপকরণ বিতরণ করেন। তারা প্রত্যেকেই এখন স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে। ২০০৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে ২০১০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার বিষয়ে ৫০টির বেশী উঠান বৈঠক করেন। সানোয়ারা আগামি ৪ বছরে ৩ টি ওয়ার্ডকে ১০০% স্যানিটেশনের আওতায় আনার পরিকল্পনা করেছেন।

উজ্জীবক হওয়ার পর সানোয়ারা তার ওয়ার্ডগুলোতে নতুন, পুরাতন মিলিয়ে প্রায় ১২ জনকে বিধবা ভাতা প্রদান করেন। প্রত্যেক বিধবা মাসে ৩০০ টাকা করে বিধবা ভাতা পান। তিনটি ওয়ার্ডে নতুন পুরাতন মিলিয়ে ১০ জন প্রতিবন্ধীকে তিনি প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান করেন। তিনি ৩ টি ওয়ার্ডের ৭০ নারীকে বয়স্ক ভাতা প্রদান করেন।

২০০৯ সালে ২৭ জুন মীরকাদিম পৌরসভায় **'উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা '** অনুষ্ঠানের জন্য তিনি সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করেন। উক্ত 'উন্মুক্ত বাজেট' অনুষ্ঠানে প্রায় ১৫০০ নারী পুরুষ অংশগ্রহণ করেছিল। রিকাবি বাজারে সোনালী কমিউনিটি সেন্টারে উজ্জীবক প্রশিক্ষণের আয়োজনের ক্ষেত্রেও তিনি আয়োজক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মীরকাদিম পৌরসভায় ২০০৯ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত জাতয়ি কন্যাশিশু দিবস উদযাপন, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন, নারী নির্যাতন বিলোপ দিবস উদযাপনের ক্ষেত্রেও তিনি আয়োজক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সানোয়ারা বেগম চার দেয়ালে আবদ্ধ একজন নারীর নাম। এক সময় এ নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। আজ মীরকাদিম পৌরসভার কাউন্সিলর। অক্লান্ত পরিশ্রম আর নিরলস প্রচেষ্টায় চার দেয়ালের বাহিরে এসে সানোয়ারা সমাজের মানুষের জন্য কাজ করতে শুরু করেন। দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উজ্জীবক প্রশিক্ষণ এবং নারী নেতৃত্বের বিকাশ শীর্ষক ফাউন্ডেশন কোর্স তার সে কাজে দ্বিগুণ উৎসাহ যুগিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে সানোয়ারা দ্বিতয়ি বারের মত কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন। আমাদের সমাজে নারীদের অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করার জন্য প্রতিটি নারীকে এগিয়ে আসতে হবে।

তথ্য সংগ্রহ ও রচনা: আবু জিসান এম. আলমগীর।

সমাপ্ত